আচার্য্য শঙ্কর।

আচার্য্য শঙ্কর

রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের সুযোগ্য শিক্ষক

এবং

'কাঠিয়া বাবা,' "চিত্তরঞ্জনের কথা" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রী শিশিরকুমার রাহা

প্রণীত

গোল্ডকুইন এণ্ড কোং, লিঃ

কলেজষ্ট্রীট্ মার্কেট :: কলিকাতা

মূল্য বার আনা

ভূমিকা

বেদ ও বেদান্তের জন্মভূমি প্রাচীন ভারতের সহিত অজ্ঞানকালিমাবৃত বর্ত্তমান ভারতের পার্থক্য কি মর্ম্মান্তিক! ইহার প্রতিবিধান একমাত্র জ্ঞানে; আচার্য্য শঙ্করের জীবন জ্ঞানের মূর্ত্তবিগ্রহ।

বর্ত্তমান জাগরণের দিনে জাতির ভবিষ্যৎ আশা ও আকাঙ্ক্ষা বালকবালিকারা যাহাতে আচার্য্য শঙ্করের পবিত্র জীবন-কাহিনী পাঠ করিয়া তাহাদের জীবনকেও তদনুরূপ পবিত্র ও মহীয়ান্ করিয়া তুলিতে পারে তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

দেশের সকল মাতাপিতা ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের পুত্রকন্যা ও ছাত্র-ছাত্রীদের হস্তে শঙ্করের পূত জীবনকাহিনী তুলিয়া দিয়া ভারতের লুপ্ত জ্ঞানগৌরবের পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করেন।

এই পুস্তকের গ্রন্থকারের লভ্যাংশ সমস্ত অর্থ শিবপুর ৮৮।১নং কলেজ রোডস্থিত "নিম্বার্ক আশ্রমে"র পাঠাগারে প্রদত্ত হইবে।

নিম্বার্ক আশ্রম, শিবপুর
অক্ষয় তৃতীয়া,
সন ১৩৪০ সাল।

শ্রীশিশিরকুমার রাহা

উৎসর্গ

উষা মা,

তোমরাই যুগে যুগে জগতের যত সব মহাপুরুষদের জন্ম দিয়েছ। আচার্য্য শঙ্কর তোমারই কোলে শোভা পাইতে থাকুক; তুমি তোমার বিশ্বব্যাপী মাতৃত্বের স্নেহধারায় অভিসিঞ্চিত করে তাঁহাকে কোলে তুলে লও এবং আশীর্ব্বাদ কর তোমার শিশিরের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হউক—শঙ্করের মত পুত্র এবং উভয়ভারতীর মত কন্যা আবার ভারতের গৃহে গৃহে জন্মগ্রহণ করুক। ইতি—

নিম্বার্ক আশ্রম, শিবপুর
অক্ষয় তৃতীয়া,
সন ১৩৪০ সাল।

তোমার স্নেহের—"শিশির"

আচার্য্য শঙ্কর

এক

যুগযুগান্তর হইতে আমাদের এই ভারতে কত মুনিঋষি, কত সাধু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া আসিতেছেন; তাঁহাদেরই পদরেণু বহন করিয়াই আমাদের এ ভারতভূমি পুণ্যভূমি। আজ যাঁহার পুণ্যকাহিনী তোমাদের বলিব, তিনি সেই সাধু মহাপুরুষদেরই একজন, আমাদের ভারতজননীর নয়নের মণি, স্নেহের পুত্তলি—আচার্য্য শঙ্কর।

এখন হইতে প্রায় সাড়ে বারশত বৎসর পূর্ব্বের কথা। দাক্ষিণাত্যে কেরল দেশে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম, নাম তার কালাডি। গ্রামের পাশ দিয়াই বহিয়া চলিয়াছে ক্ষুদ্র আলোয়াই নদীটি। এই গ্রামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন; সেই ব্রাহ্মণের না ছিল খাওয়ার অভাব, না ছিল পরার দুঃখ, কিন্তু তবুও ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর মনে সুখ ছিল না। উভয়েই বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছেন, কিন্তু এখনও পুত্রমুখ দর্শন হইল না,—ইহাই তাঁহাদের দুঃখের কারণ। ব্রাহ্মণের নাম শিবগুরু, ব্রাহ্মণীর নাম বিশিষ্টা দেবী। জাতিতে তাঁহারা নম্বুরী

ব্রাহ্মণ। শিবগুরু চরিত্রবান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ; ব্রাহ্মণীও দেবদ্বিজে ভক্তিমতী এবং অতিথিসংকারপরায়ণা। শয়নে স্বপনে এখন তাঁহাদের একমাত্র চিন্তা কি করিয়া পুত্রমুখ দর্শন হয়। তাঁহাদের বাড়ীর নিকটেই বৃষ নামক পর্ব্বতে চন্দ্রমৌলীশ্বর নামে এক শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। চন্দ্রমৌলীশ্বর বড় জাগ্রত দেবতা; তাঁহার নিকট যিনি যাহা প্রার্থনা করেন, তিনি তাহা পূর্ণ করেন। শিবগুরু ও বিশিষ্টা দেবী পুত্রলাভ-কামনায় চন্দ্রমৌলীশ্বরের পূজা ও আরাধনায় মনোযোগী হইলেন। শিবের অপর এক নাম আশুতোষ; আশুতোষ সহজেই সন্তুষ্ট হন। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর আকুল প্রার্থনায় আশুতোষ তুষ্ট হইলেন। একদিন চন্দ্রমৌলীশ্বর শিবগুরুকে দর্শন দিয়া বর চাহিতে বলিলেন। শিবগুরু মহাদেবের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ ও দীর্ঘায়ু পুত্র চাহিলেন। চন্দ্রমৌলীশ্বর, হয় তাহাকে শিবসদৃশ পুত্র নয় দীর্ঘায়ু পুত্র, দুইএর একটি প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ আর কি করেন, দুই যখন একসঙ্গে মিলিবে না, তখন শিব-সদৃশ পুত্রই কামনা করিলেন।

যথাসময়ে শিবগুরু পুত্রমুখ দর্শন করিলেন। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর নিরানন্দ প্রাণে আনন্দের বান ডাকিল। শিবের বরে পুত্র হইয়াছে, তাই পুত্রের নাম রাখিলেন শঙ্কর। শিব-সদৃশ পুত্র হইবে চন্দ্রমৌলীশ্বর এই বর দিয়াছিলেন, কাজেই বিশিষ্টা দেবীর কোল আলো করিয়া আজ তাঁহাকেই স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিতে হইল। ৬০৮ শকাব্দের (ইংরাজী ৬৮৬

খৃষ্টাব্দ) ১২ই বৈশাখ শঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন; সে দিন ছিল শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথি।

দিন যায় মাস আসে, মাস যায় বৎসর আসে,—এমনি করিয়া শঙ্কব তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করিলেন। তৃতীয় বৎসর পূর্ণ হইতে চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে শিশু শঙ্করের অদ্ভুত শক্তি সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। শঙ্কর যাহা শুনেন তাহাই শিখেন, একবার যাহা শিখেন তাহা আর ভুলেন না। তিন বৎসরের শিশু মাতৃভাষা মালয়ালম্ এমন সুন্দর শিখিলেন যে ঐ ভাষার সকল পুস্তক পড়িতে পারিতেন। আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপ্রতিবাসী সকলেই শিশু শঙ্করের অদ্ভুত মেধার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন। পিতামাতাও আনন্দে মুগ্ধ হইলেন। শিবগুরু মনে করিলেন পাঁচ বৎসর বয়সে পুত্রের উপনয়ন দিয়া লেখাপড়া শিখিবার জন্য তাহাকে গুরুগৃহে পাঠাইবেন। মানুষের সকল সাধ পূর্ণ হয় না, তাঁহারও এ সাধ পূর্ণ হইল না। শঙ্করের পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই শিবগুরু সংসার হইতে বিদায় লইলেন। পিতৃহীন বালক এখন মায়ের কোলেই মানুষ হইতে লাগিলেন। শঙ্করের বয়স যখন পাঁচ বৎসর হইল, বিশিষ্টা দেবী মৃত পতির বাসনা অপূর্ণ রাখিলেন না; পুত্রের উপনয়ন দিয়া বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাহাকে গুরুগৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

গুণ থাকিলে সবাই ভালবাসে। শঙ্করও নিজগুণে

গুরুগৃহের সকলেরই ভালবাসার পাত্র হইলেন। পূর্ব্বকালে ছাত্রগণ গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যার্জ্জন করিত। গুরু বিদ্যাদান করিয়া শিষ্যদের নিকট হইতে টাকা পয়সা বা কোনরূপ অর্থই গ্রহণ করিতেন না; কিন্তু শিষ্যকে শক্তি অনুসারে গুরুগৃহের সমস্ত কাজকর্ম্মই করিতে হইত।

গুরুগৃহে শঙ্করকে কিন্তু কাজকর্ম্ম বিশেষ কিছুই করিতে হইত না। গুরু, গুরুপত্নী, সহপাঠী সকলেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ—কাজেই শঙ্কর আপন ইচ্ছায় যাহা করিতেন, তাহাতেই সকলে সন্তুষ্ট হইতেন। শিখিবার শক্তি ছিল শঙ্করের অদ্ভুত। যাহা একবার শুনিতেন তাহাই শিখিতেন, গুরু যাহা একবার বলিয়া·দিতেন তাহা আর ভুলিতেন না। গুরুরও আনন্দ, শঙ্কর যত শিখেন ততই শিখান।

শঙ্কর একদিন ভিক্ষা করিতে করিতে এক দরিদ্রা ব্রাহ্মণীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। শঙ্কর জানিতেন না ব্রাহ্মণী দরিদ্র। ব্রাহ্মণী মহাবিপদে পড়িলেন; ভিক্ষা দিবার মত সামান্য একমুঠা চাউলও যে তাঁহার ঘরে নাই। গৃহস্থের বাড়ী ভিক্ষা করিতে আসিয়া ব্রাহ্মণ ভিক্ষা না পাইয়া ফিরিয়া যাইবেন ভাবিয়া অবশেষে তিনি একটি আমলকী আনিয়া বালকের হাতে দিলেন। শঙ্কর বুঝিলেন ব্রাহ্মণী বড় গরীব: তাঁহার মনে বড় দুঃখ হইল। কি করিলে ব্রাহ্মণীর অভাব অনটন দূর হয় শঙ্কর তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। শঙ্কর বালক হইলেও পরের দুঃখ বুঝিতেন।

লক্ষ্মীদেবী সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁহার কৃপা হইলে ব্রাহ্মণীর দুঃখ দূর হইতে পারে। শঙ্কর আকুল প্রাণে তাঁহার নিকট ব্রাহ্মণীর দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে কারিতে গুরুগৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

সরল মনের আকুল প্রার্থনা বিফল হয় না। বালক শঙ্করের প্রার্থনাও বিফল হইল না। পরের দিন ব্রাহ্মণী ঘুম হইতে উঠিয়া দেখেন তাঁহার আঙ্গিনা ও ঘরের মেজে সোনার আমলকীতে ভরিয়া আছে। ব্রাহ্মণী ত অবাক্! অবশেষে, পূর্ব্বদিন ব্রহ্মচারী বালককে আমলকী ভিক্ষা দেওয়ার কথা মনে হইল, তখন তিনি সমস্তই বুঝিলেন। বুঝিলেন, ব্রহ্মচারী বালকের জন্যই আজ তাঁহার দারিদ্র্য-দুঃখ চিরদিনের জন্য দূর হইতে চলিয়াছে। ব্রাহ্মণী যাহাকে দেখেন, তাহাকেই বলেন, আর আনন্দ করেন।

শঙ্করের বিদ্যাশিক্ষা সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! দেখিতে দেখিতে তিনি গ্রন্থের পর গ্রন্থ পড়িয়া যান। যাহা পড়িয়া যান তাহাই শিখেন, তাহাই তাঁহার কণ্ঠস্থ। দুই বৎসরে শঙ্করের বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইল ;—শঙ্কর সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেন। অন্যের পক্ষে যে বিদ্যা অর্জ্জন করিতে ষোল বৎসর কিম্বা তাহারও অপেক্ষা বেশী সময় লাগিত, শঙ্করের সেখানে মাত্র দুই বৎসর লাগিল। গুরু, সহপাঠী সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত— সকলেই ভাবেন এ অদ্ভুত বালকের সবই অদ্ভুত। গুরু এইবার শঙ্করকে গৃহে ফিরিতে অনুমতি দিলেন—কিন্তু

বড় দুঃখে। এমন শিষ্যকে ছাড়িয়া দিতে কাহার না দুঃখ হয় ?

শঙ্কর বয়সে বালক হইলেও জ্ঞানে এখন আর বালক নহেন। তাঁহার বিদ্যা, তাঁহার বুদ্ধি, তাঁহার পাণ্ডিত্য, সে কি আর সামান্য বালকে সম্ভবে ? বিদ্যাশিক্ষা সমাপন করিয়া শঙ্কর গৃহে আসিলেন, জননী তাঁহার বিবাহ দিতে চাহিলেন। বিদ্যা শিখিয়া বিবাহ করিয়া গৃহী হইবে, শাস্ত্রের এই বিধান। কিন্তু ইহা সাধারণ নিয়ম ; ব্যক্তিবিশেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে ; শঙ্করের বেলাও তাহাই হইল। শঙ্কর বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক ; অবিবাহিত থাকিয়া সারাজীবন ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিবেন ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। জননী আর কি করেন ; প্রাণপ্রিয় পুত্রের ইচ্ছাতেই তাঁহার মত দিতে হইল।

ধন, বিদ্যা যাহাই আমরা উপার্জ্জন করিনা কেন, তাহা যদি আমরা দান করিতে পারি, তবেই তাহার সদ্ব্যবহার হয়। শঙ্কর গৃহে টোল খুলিয়া বিদ্যাদান করিয়া বিদ্যার সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। দলে দলে ছাত্র শঙ্করের কাছে পড়িতে আসিতে লাগিল। হাটে মাঠে সকলেরই মুখে তাঁহার গুণের কথা, তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা।

শঙ্কর সাতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। মাতৃভক্ত না হইলে কি কেহ কখনও এত গুণের আধার হইতে পারে ? মায়ের

এতটুকু দুঃখ তিনি দেখিতে পারিতেন না। মায়ের সামান্ত দুঃখকষ্ট দূর করিতে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। মাও শঙ্করের মত পুত্র পাইয়া আনন্দে ও গৌরবে আনন্দিতা ও গৌরবান্বিতা। বিশিষ্টা দেবী স্নান করিতে প্রতিদিন নদীতে যাইতেন। স্নান করিয়া মন্দিরে মন্দিরে দেবদেবী দর্শন ও পূজা করিয়া অনেক বেলায় গৃহে ফিরিতেন। একদিন মাতাকে যথা-সময়ে গৃহে ফিরিতে না দেখিয়া শঙ্কর বড় চিন্তিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে মাতার অন্বেষণে নদীর পথ ধরিয়া চলিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন জননী পথিমধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন। শঙ্কর বুঝিলেন ভীষণ রৌদ্রে অনেকটা পথ চলিয়াই বৃদ্ধা জননীর এই অবস্থা। তাঁহার দুঃখ হইল। তিনি তাড়াতাড়ি জল আনিয়া বাতাস করিয়া জননীকে সুস্থ করিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন। শঙ্কর মহা ভাবনায় পড়িলেন। কি করিয়া জননীর পথ চলার ক্লেশ দূর করা যায়? আলোয়াই নদীটি তাঁহাদের বাড়ীর অনেক দূর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, অথচ জননীকেও প্রতিদিন নদীতে স্নান করিতে যাইতে হইবে। জননীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া শঙ্কর সম্ভব অসম্ভব ভুলিয়া গেলেন; তাঁহার মনে হইতে লাগিল এমনটি কি হয় না যে, আলোয়াই নদীটি তাঁহাদের বাড়ীর পাশ দিয়াই বহিয়া যায়। মায়ের দুঃখে মাতৃভক্ত শঙ্করের চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,

ব্যাকুল হইয়া আকুল প্রাণে নদীটি যাহাতে তাঁহার বাড়ীর পাশ দিয়াই বহিয়া যায়, সেজন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মাতৃভক্তের এ প্রার্থনা ব্যর্থ হইল না। তাও কি কখন হয়? ভগবান্ বালক হৃদয়ের করুণ প্রার্থনা, মাতৃ-ভক্তের প্রাণের দাবী পূরণ না করিয়া পারিলেন না। ভগবান্ যে ভক্তের দাস! ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য যুগে যুগে তাঁহাকে কত লীলাই না খেলিতে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও খেলিতে হইবে! কিছুদিন পরে দেখা গেল আলোয়াই নদীটির গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—নদীটি শঙ্করের বাড়ীর পাশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। মায়ের পথচলার দুঃখ দূর হইল, শঙ্করের আনন্দ আর ধরে না। জগৎবাসী মাতৃভক্তের অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইল।

কেরল দেশে এ সময় রাজা রাজশেখর রাজ্য করিতেন। রাজশেখর বিদ্বান্ এবং বিদ্যানুরাগী ছিলেন। শঙ্করের অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তাঁহার বড় ইচ্ছা শঙ্কর একবার তাঁহার রাজসভায় পদার্পণ করেন। কিন্তু শঙ্কর রাজসভায় যাইতে অনিচ্ছুক। গুণীই গুণীর গুণ বুঝেন, তাই রাজা রাজশেখর নিজেই পাত্রমিত্রসহ শঙ্করের গৃহে উপস্থিত হইলেন। শঙ্কর আপন শক্তি-অনুসারে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে ত্রুটি করিলেন না। মিলনের প্রথমেই রাজা শিশু শঙ্করের ব্যবহারে ও সৌজন্যে মুগ্ধ হইলেন। উভয়ের মধ্যে কত কথা, কত শাস্ত্রের কথা উঠিল, কত তর্ক বাধিল—আবার

তাহার মীমাংসাও হইল। উভয়েই উভয়ের গুণে আকৃষ্ট হইলেন। রাজশেখর বালক শঙ্করের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন। কথাবার্ত্তায় অনেক সময় কাটিয়া গেল। রাজা বিদায় লইবার সময় শঙ্করের পদতলে সহস্র মুদ্রা রাখিয়া প্রণাম করিলেন। শঙ্কর ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্রজ্ঞ ; শাস্ত্রপাঠের ফল তাঁহার জীবনে ফলিয়াছে। ব্রাহ্মণ নির্লোভ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন বস্তু আকাঙ্খা করেন না। শঙ্করের গৃহে ত মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের অভাব নাই, কাজেই রাজার দেওয়া সহস্র মুদ্রা তিনি লইলেন না। বালক শঙ্করের এই নির্লোভিতা দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন ; বুঝিলেন, ধর্ম্মবলে এবং ত্যাগবলে বলীয়ান হইয়াই যে ব্রাহ্মণ প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত—শুধু কথার কথা নয়, শঙ্করের জীবন ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

একদিন কয়েকজন ব্রাহ্মণ শঙ্করের গৃহে অতিথি হইলেন। শঙ্করের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সামান্য বালকে এইরূপ পাণ্ডিত্য, এইরূপ বিদ্যাবত্তা কি করিয়া সম্ভবে? তাঁহারা ছিলেন দৈবজ্ঞ। শঙ্করের কোষ্ঠী দেখিয়া বালকের ভবিষ্যৎ জানিতে তাঁহাদের বড় কৌতূহল হইল। বিশিষ্টাদেবী কোষ্ঠীখানি আনিয়া তাঁহাদের হাতে দিলেন। শঙ্করের ভবিষ্যৎ জানিতে তাঁহারও বড় আগ্রহ। কোষ্ঠীর ফল বিচার করিয়া দৈবজ্ঞেরা যাহা দেখিলেন তাহা বড় অপূর্ব্ব। বালক ভবিষ্যৎ জীবনে একজন অদ্বিতীয় পুরুষ হইবেন।

তাঁহার পাণ্ডিত্য, তাঁহার ধর্ম্মবল এক সময় সমস্ত ভারতকে তাঁহার পদানত করিবে। তাঁহার কীর্ত্তি, তাঁহার যশঃ আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপ্ত হইবে; শুনিতে শুনিতে মায়ের হৃদয় আনন্দে ও গৌরবে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু শেষ দিকে যাহা শুনিলেন তাহাতে তাঁহার সুখের সাগরে দুঃখের বান ডাকিল। শঙ্করের আয়ুঃ যে বড় অল্প। আট, ষোল বা বত্রিশ বৎসর বয়সেই তাঁহার মৃত্যুর সম্ভাবনা রহিয়াছে। শঙ্করও আট বৎসরে পদার্পণ করিতে চলিয়াছেন, কাজেই বিশিষ্টা দেবী মহা ভাবনায় পড়িলেন। এদিকে কোষ্ঠীফলে মৃত্যুর কথা শুনিয়া শঙ্করের মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। মাত্র বত্রিশ বৎসর ত এই জীবন! মানবজীবন সৃষ্টিজগতে শ্রেষ্ঠ ও অমূল্য। এ জীবন যাহাতে ব্যর্থ না হয় তাহা করিতে হইবে। দুর্লভ মানবজীবনের সার্থকতা কিসে? আত্মজ্ঞান বা ভগবানলাভেই তাহার সার্থকতা। কিন্তু সে তো আর সহজ কথা নয়। সেজন্য চাই প্রাণপণ চেষ্টা—মৃত্যু-পণ সাধনা। শঙ্কর ঠিক করিলেন সকল রকমের দুঃখ সহিয়া, সকল রকমের কঠোর সাধনা করিয়াই এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে। সংসারের সুখ দু'দিনের, দু'দিন পরেই ফুরাইয়া যায়। ধনদৌলত, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব লইয়া যে আনন্দ তাহা আজ আছে, কাল নাই। সুখের সঙ্গে দুঃখ যেন পিছনে পিছনে চলিতেছে। কাজেই বিদ্বান্ যে, বুদ্ধিমান্ যে, সে এই দু'দিনের সুখে—ক্ষণস্থায়ী

আনন্দে—ভুলিয়া থাকিতে পারে কি? সে চাহিবে—দু'দিনের নয়, চিরদিনের—ক্ষণস্থায়ী নয়, চিরস্থায়ী—সুখ ও আনন্দ। কিন্তু সংসারের কোন বস্তুতেই তো চিরদিনের সুখ, চিরস্থায়ী আনন্দ মিলে না। একমাত্র ভগবানলাভেই সেই সুখ—সেই চিরস্থায়ী আনন্দ লাভ হইতে পারে। মূল্য না দিয়া কোন কিছুই লাভ করা যায় না। সেই চিরস্থায়ী সুখ—আনন্দস্বরূপ ভগবানকে—লাভ করিতে হইলেও মূল্য দিতে হয়; ক্ষণস্থায়ী সুখের বস্তুগুলি ত্যাগ করিয়াই সে আনন্দের মূল্য দিতে হয়। শঙ্করও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন দু'দিনের আনন্দে, দু'দিনের সুখস্বপ্নে আর ভুলিয়া থাকিবেন না।

একদিন সময় বুঝিয়া শঙ্কর মনের কথা বিশিষ্টা দেবীকে বলিলেন। শঙ্করের কথা শুনিয়া তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রাণপ্রিয় পুত্র তাঁহাকে ছাড়িয়া সন্ন্যাস লইবে, এ চিন্তা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইল, তিনি বড় উতলা হইয়া উঠিলেন। জননীর এ ভাব দেখিয়া শঙ্কর নানাভাবে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন, এবং তারপর আর জননীকে কখনও এ কথা বলিতেন না।

একদিন মাতাপুত্র স্নান করিবার জন্য নদীতে গিয়াছেন। শত শত নরনারী সেখানে স্নান করিতেছে—শঙ্করও স্নান করিতে লাগিলেন। স্নান করিতে করিতে শঙ্কর বুঝিতে পারিলেন জলের নীচে এক কুম্ভীর তাঁহাকে ধরিয়াছে।

যাঁহারা সেখানে স্নান করিতেছিলেন, সকলেই আসিয়া শঙ্করকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া কুম্ভীর ক্রমশঃ শঙ্করকে লইয়া অধিক জলে অগ্রসর হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিলেন শঙ্করের আর রক্ষা নাই। শঙ্করের আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় বিশিষ্টা দেবী উচ্চৈঃ-স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেই সময় শঙ্কর একবার জননীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মা! তুমি তো আমাকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিলে না। এখন কুমীরের মুখে প্রাণ যাইতেছে। যাহাহউক এখনও যদি অনুমতি দাও, তাহা হইলে অন্তক-সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারি এবং তাহা হইলেও পরজন্মে আমার মঙ্গল হইবে।" জননী আর কি করেন, প্রাণপ্রিয় পুত্রের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। সন্ন্যাসের অনুমতি দিয়াই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পুত্রের মৃত্যুদৃশ্য বুঝি চোখে দেখিতে পারিবেন না। শঙ্কর মায়ের অনুমতি পাইয়া মনে মনে ভগবচ্চরণে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে সমর্পণ করিয়া দিয়া মনে মনেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। অনতিদূরে এক দল ধীবর মাছ ধরিতেছিল। ঠিক এই সময় তাহাদের নজর সে দিকে পড়িল। তাহারা তাড়াতাড়ি জাল দ্বারা কুম্ভীরটাকে ঘিরিয়া ফেলিল; কুম্ভীরও জালে পড়িয়া শঙ্করকে ছাড়িয়া দিল বটে, কিন্তু উহারা কুম্ভীরটাকে টানিয়া উপরে তুলিল। উপস্থিত জনমণ্ডলীর আনন্দ আর ধরে না। কেহ কুম্ভীরকে দেখিয়া, কেহ শঙ্করকে দেখিয়া আনন্দ করিতে লাগিল;

আবার কেহ কেহ বিশিষ্টা দেবীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের যত্ন ও শুশ্রূষায় বিশিষ্টা-দেবীর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। তিনি চোখ মেলিয়াই দেখিলেন প্রাণপ্রিয় পুত্র তাঁহারই পাশে রহিয়াছে। আনন্দে অধীর হইয়া তখন তিনি উঠিয়া বসিলেন। জননী মৃতপ্রায় পুত্রকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন।

দুই

মায়ের অনুমতি ব্যতীত শঙ্করের সন্ন্যাস গ্রহণ করা হয় না, আবার মাও প্রাণ থাকিতে প্রাণপ্রিয় পুত্রকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিবেন না। ভাল কাজে ভগবান সহায়; তাই ভগবানেরই লীলায় কুম্ভীরের মুখে প্রাণ যাওয়ার কৌশলে শঙ্কর মায়ের নিকট সন্ন্যাসেব অনুমতি পাইলেন।

দিবা অবসান প্রায়—সন্ধ্যা হইতে চলিয়াছে। শঙ্কর জননীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "মা, আমি ত সন্ন্যাসী, আমার পক্ষে গৃহবাস নিষিদ্ধ। অতএব পাশের বাগানে গাছতলায় আমার রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা কর।" রাত্রি-প্রভাতে যথারীতি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শঙ্কর গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবেন এই কথা শুনিয়া জননীর মাথা ঘুরিতে লাগিল, কহিলেন, "সে কি বাবা, এই বয়সে আবার সন্ন্যাস কি? বড় হও তখন দেখা যাইবে। অষ্টম বৎসরের বালকের সন্ন্যাস, সে কি কখনও হইয়াছে বা কেহ কখনও শুনিয়াছে? কুম্ভীরের মুখে তোমার প্রাণ যায় দেখিয়া সে সময় তোমাকে সন্ন্যাসগ্রহণের অনুমতি দিয়াছিলাম বটে; তখন তুমি

প্রাণে বাঁচিবে না মনে করিয়াই অনুমতি দিয়াছিলাম, কিন্তু এখন সে কথার মূল্য কি আছে ?” শঙ্কর মহা বিপদ গণিলেন। মায়ের দৃঢ়তা দেখিয়া প্রথমে একটু চিন্তিত হইলেন। অবশেষে খুব দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া কহিলেন, “মা ! এ কি বলিতেছ ? একবার অনুমতি দিয়া পরে তাহা প্রত্যাহার করা মোটেই ঠিক হইবে না। অধিকন্তু ইহা মিথ্যাচার হইবে। মনে রাখিও আমি মরিতে বসিয়াছিলাম। তোমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইলে, আমি যখন ভগবানেব চরণে নিজেকে সঁপিয়া দিলাম, ঠিক সেই সময়ই আমার বাঁচিবার উপায় হইল। কাজেই আজ যখন তাঁহারই জন্য সন্ন্যাস লইতে যাইতেছি, তখন বাধা দেওয়া তোমার উচিত হয় কি ?” জননী তবুও আপত্তি করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের নানা রকম অসুবিধার কথা তুলিয়া মাতৃভক্ত শঙ্করের মন ফিরাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—“বাছা, তুমি চলিয়া গেলে আমার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা কে করিবে ? তুমি বাঁচিয়া থাকিতে, আমি মরিলে, অন্যে আমার মুখাগ্নি করিবে—এই চিন্তা আমাকে বড়ই কষ্ট দিতেছে।” শঙ্কর মাতৃভক্ত ; মায়ের এতটুকু দুঃখও তিনি সহিতে পারেন না এ কথাও সত্য ; কিন্তু আজ যেজন্য তিনি মাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, তাহা যে শুধু নিজেরই জন্য তা নয়। তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইলে, মায়ের—শুধু মায়ের কেন সমস্ত জগতেরও—কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন। কাজেই, মায়ের

এই সব কথায় শঙ্কর সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না, বলিলেন, “মা, আমি যাওয়ার পূর্ব্বে তোমার ভরণপোষণের সমস্ত ব্যবস্থাই করিয়া যাইব। মুখাগ্নির কথা বলিতেছিলে? যদিও সন্ন্যাসীর পক্ষে ইহা নিষিদ্ধ, তবু তোমাকে কথা দিতেছি, তোমার অন্তিমকালে উপস্থিত থাকিয়া, আমি নিজেই মুখাগ্নি করিব। শাস্ত্রে আছে জননী যদি বিদেশস্থ পুত্রের কথা স্মরণ করেন, তবে তাহার মুখে স্তন্যদুগ্ধের স্বাদ অনুভূত হয়। অন্তিম সময়ে তুমি আমার কথা স্মরণ করিলেই আমি বুঝিতে পারিব। ভগবৎ-কৃপায় এবং তোমার আশীর্ব্বাদে সিদ্ধ-মনোরথ হইলে, আমি যত দূরেই থাকি না কেন, তৎক্ষণাৎ তোমার নিকট উপস্থিত হইতে পারিব।” এই ভাবে নানা কথা বলিয়া শঙ্কর মাকে বুঝাইতে লাগিলেন।

শঙ্কর ঘরের বাহিরে বৃক্ষতলেই রাত্রি যাপন করিলেন। দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় বিশিষ্টাদেবীর রাত্রি কাটিল। কিন্তু কি জানি কেন রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মনও পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কোথা হইতে মনে অপূর্ব্ব সাহস দেখা দিল। পূর্ব্বদিন শঙ্করকে জন্মের মত বিদায় দিতে হইবে ভাবিয়া তাঁহার মনে যে কাতরতা দেখা দিয়াছিল, আজ আর সে কাতরতা নাই।

প্রভাত হইল। শঙ্কর একজন আত্মীয়কে ডাকাইলেন এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি আত্মীয়ের হাতে দিয়া মাতার খাওয়া-পরার সমস্ত রকম বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তারপর সন্ন্যাসের

ব্যবস্থা; বিশিষ্টাদেবী নিজেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। নাপিত আসিল; শঙ্কর মস্তক মুণ্ডন করিলেন। গৈরিক রংয়ে কাপড় ছোপান হইল শাস্ত্রের বিধান অনুসারে নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করিলেন, বিরজাহোমও সম্পন্ন হইল। তাহার পর তিনি গৈরিক বসন পরিধান করিয়া হস্তে দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করিলেন। অষ্টম বৎসরের বালক শঙ্কর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহ ছাড়িয়া চলিলেন। তাঁহার বড় সাধের গৃহ, বিধবা জননী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সকলকে পিছনে ফেলিয়া, সকলকে কাঁদাইয়া, শঙ্কর চলিয়াছেন; এ দৃশ্য—এ করুণ মধুর দৃশ্য—বুঝি আর জগত-ইতিহাসে মিলিবে না! পাগলিনীপ্রায় জননী, বিরহকাতর আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই শঙ্করের পিছনে পিছনে চলিয়াছেন। শঙ্কর প্রথমেই নিকটবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। বিগ্রহসম্মুখে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিলেন, ও সুমধুর কণ্ঠে ভাবগদগদ স্বরে স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। মন্দিরের পূজারী নির্ম্মাল্য দিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বালক সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ও সুললিত কণ্ঠের স্তবপাঠ পূজারী ও আশ-পাশের জন-মণ্ডলী সকলকেই ভাববিহ্বল করিয়া তুলিল—যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, মুখে হাসি, চোখে জল, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

শঙ্করের প্রার্থনায় আলেয়াই নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ফলে, শ্রীকৃষ্ণ-

মন্দির শীঘ্রই নদীগর্ভে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা। সেজন্য শঙ্কর নিজ হস্তে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ অন্য স্থানে স্থাপন করিলেন এবং গ্রামবাসীদের সেখানে একটী মন্দির নির্ম্মান করিতে বলিলেন। তৎপরে জন্মের শোধ সকলের নিকট, জননী জন্মভূমির নিকট বিদায় লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিলেন।

শঙ্কর চলিয়াছেন, আপন মনে, আপন চিন্তায় বিভোর হইয়া চলিয়াছেন। তাঁহার গতি উত্তর দিকে।

সদ্‌গুরু চাই—সদ্‌গুরু না হইলে জগতে কোন কিছুই শিক্ষা করা যায় না। শঙ্কর আজ যে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য গৃহ ছাড়িয়া বাহির হইয়াছেন, তাহার জন্য উপযুক্ত উপদেষ্টা চাই। পাঠ্যাবস্থায় আচার্য্যগৃহে থাকিবার সময় শঙ্কর শুনিয়াছিলেন নর্ম্মদাতীরে এক মহাযাগী হাজার বৎসর যাবৎ সমাধিস্থ আছেন। তাঁহার নাম গোবিন্দপাদ বা পাতঞ্জলিদেব। শঙ্কর নর্ম্মদা অভিমুখে গোবিন্দপাদের খোঁজে চলিলেন। কালাডি হইতে নর্ম্মদাতীর বড় কম পথ নয়। পদব্রজে প্রায় দু'মাসের পথ। শঙ্কর বহু গ্রাম, নগর ও প্রান্তর অতিক্রম করিয়া দিনের পর দিন চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে তিনি এক রাজ্যে উপস্থিত হইলেন, সে রাজ্যের নাম কদম্ব বা বনবাসা। পথক্লান্ত শঙ্কর তুঙ্গভদ্রানদীর তীরে এক নির্জ্জন স্থানে একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময় এক আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিতে পাইলেন। তিনি

দেখিলেন কতকগুলি ভেকশাবক জল হইতে উঠিয়া একখানি পাথরের উপর বসিয়াছে। ভীষণ রৌদ্র চারিদিকে যেন আগুন ছড়াইতেছিল। পাথরখানিও রৌদ্রে তাতিয়া আগুন হইয়া উঠিল। পাথরের গরম সহ্য করিতে না পারিয়া ভেক-শাবকগুলি জলে নামিয়া যাইতে চাহিতেছে, এমন সময় একটি মস্ত বড় সাপ জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া তাহাদের উপর ফণা বিস্তার করিয়া ছায়া দিতে লাগিল। এ দৃশ্য বড়ই আশ্চর্য্যজনক। সর্প ও ভেকের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ; সাধারণ নিয়মের এই অভূতপূর্ব্ব ব্যতিক্রম দেখিয়া তিনি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ইহাব কারণ কি ভাবিতে ভাবিতে তিনি এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলেন। নিকটেই একটি পাহাড়, তাহাতে উঠিবার রাস্তা রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। পাহাড়ের মাথায় একটি কুটীর রহিয়াছে। সরুপথ ধরিয়া শঙ্কর উপরে উঠিলেন এবং কুটীরে এক সাধু বসিয়া আছেন দেখিতে পাইলেন। ভক্তি-বিনম্রভাবে শঙ্কর সাধুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। সাধু তাঁহার পরিচয় লইলেন ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। কথায় কথায় শঙ্কর সর্প ও ভেকের ঘটনাটি বলিলেন এবং স্থানের পরিচয় জানিতে চাহিলেন। সাধু কহিলেন ইহা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির তপস্যা-স্থান; তাঁহারা শিষ্যপরম্পরাক্রমে এখানে থাকিয়া তপস্যা করিতেছেন। শঙ্কর এখন বুঝিলেন সর্প ও ভেকের মধ্যে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমের কারণ কি?

তপস্যার ফল যে কি তাহাও ভাল করিয়াই বুঝিলেন। সাধক তপস্যা করিয়া নিজে লাভবান তো হনই, তাহাছাড়া যে স্থানে সাধক তপস্যা করেন সে স্থানও তাঁহার তপোপ্রভাবে পূত ও পবিত্র হইয়া মর্ত্তভূমি দেবভূমিতে এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ ভীষণ বনভূমি প্রেমভূমিতে পরিণত হয়।

দিন, সপ্তাহ, মাস, এইরূপে দুই মাস চলিয়া শঙ্কর নর্ম্মদা-তীরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু হাজার বৎসরের সমাধিস্থ যোগীর খোঁজ কোথায় মিলিবে? বালক, বৃদ্ধ, যুবা অনেককেই জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সহস্র বৎসরের সমাধিস্থ যোগীর খবর কেহই দিতে পারিল না। হাজার বৎসরের যোগীর কথা শুনিয়া সকলেই বালকের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে আর ভাবে, যেমন অদ্ভুত এ বালক, তাঁহার অনুসন্ধানের বস্তুও তেমনি অদ্ভূত।

অবশেষে শঙ্কর শুনিতে পাইলেন ওঁকারনাথ পর্ব্বতে এক মহাযোগী আছেন, তবে তিনিই সেই গোবিন্দপাদ কিনা তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। যাহাহউক, শঙ্কর ওঁকারনাথ পর্ব্বতের দিকে চলিলেন। ওঁকারনাথ বড় মনোরম স্থান। নর্ম্মদা-মেখলা ওঁকারনাথ পর্ব্বতটি দেখিতে একটি দ্বীপের ন্যায়; ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মনপ্রাণ-বিমোহনকারী। এখানে মহাকাল এবং ওঁকারনাথ নামক শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। শঙ্কর ওঁকারনাথে উপস্থিত হইলেন এবং শিবদর্শন

ও পূজাদি করিয়া প্রীত হইলেন। এখানেও অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু গোবিন্দপাদের খবর পাইলেন না ; তবে একজনের নিকট জানিতে পারিলেন, ওঁকারনাথ পর্ব্বতের নীচে এক স্থানে অনেকগুলি সন্ন্যাসী বাস করেন। ভাবিলেন উঁহাদের নিকট যাইয়া খোঁজ করা যাউক, সন্ধান মিলিলেও মিলিতে পারে। শঙ্কর সেখানে যাইয়া দেখিলেন একটি পাষাণনির্ম্মিত ঘরে কয়েকজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন, —সকলেই কিন্তু আপন আপন ভাবে বিভোর। নিকটে যাইয়া শঙ্কর যোগী গোবিন্দপাদের খোঁজ করিলেন, সকলেই বিস্মিত হইয়া বালকের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। মনের ভাব, ইহাকে দেখিতে সামান্য বালক মাত্র, কিন্তু সে যোগী গোবিন্দপাদের খবর পাইল কি করিয়া ! বালক হইলেও তাঁহার সন্ন্যাসীর বেশ, বৈরাগ্যোজ্জ্বল মুখকান্তি সকলেরই হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক কবিল। একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী কহিলেন, "হাঁ, তিনি এখানেই আছেন। আপনার তাঁহাকে কি প্রয়োজন ?" তখন শঙ্কর দীর্ঘ কালের পথহাঁটা সার্থক হইয়াছে মনে করিলেন, এবং যোগী গোবিন্দপাদকে গুরুত্বে বরণ করিবার ইচ্ছা বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট প্রকাশ করিলেন। সন্ন্যাসী বালকের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, সদ্‌গুরু লাভ করিবার জন্য অসীম উদ্যম প্রভৃতির কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। উভয়ের মধ্যে নানা কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। শঙ্কর শুনিলেন সকলেরই উদ্দেশ্য এক, সকলেই মহাযোগী গোবিন্দপাদের

নিকট দীক্ষা লইবার জন্য আসিয়াছেন। গোবিন্দপাদ এখন সমাধিস্থ, তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হওয়ার অপেক্ষায় সকলেই অপেক্ষা করিতেছেন। শঙ্কর তখনই একবার তাঁহাকে দর্শন করিতে চাহিলেন। যে ঘরে তাঁহারা বসিয়াছিলেন সেই ঘরেরই নীচে একটি গুহায় যোগীবর সমাধিমগ্ন। গুহার ভিতর অন্ধকার। প্রকাণ্ড একখানি প্রস্তর গুহামুখে রহিয়াছে। ভিতরে যাইবার পথটি খুবই অপরিসর। অন্ধকারে দেখিতে পাইবেন না বলিয়া প্রদীপহস্তে শঙ্কর গুহামুখে উপস্থিত হইলেন। ধীরে ধীরে প্রস্তরখানি সরাইয়া গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রদীপের আলোতে যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন। দেখিলেন এক জটাজুট-মণ্ডিত শীর্ণকায় তপস্বী যোগাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার মুখের সেই শতোজ্জ্বল প্রভা দর্শকমাত্রকেই মোহিত করে। দেহ যেন প্রাণহীন—নিশ্চল ও নিস্পন্দ। অনিমেষনয়নে শঙ্কর যোগীবরের মুখকমল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; কত ভাবের হিল্লোল তাঁহার হৃদয়সাগরে উঠিতে লাগিল—আবেগে তাঁহার চোখ জলে ভরিয়া আসিল। বুঝিবা আপনা হইতেই এক সুমধুর স্তব তাঁহার সুকণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল। বালকের সেই ভক্তি-বিনম্র মধুর স্তব কি জানি কেমন করিয়া সহস্র বৎসরের সমাধিস্থ যোগীবরের হৃদয় স্পর্শ করিল। তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল এবং তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন।

কিছুদিন গত হইলে শঙ্করের বহুদিনের বাসনা পূর্ণ হইল। যোগীবর শঙ্করকে এবং দীক্ষা লইবার জন্য সেখানে অন্য যাঁহারা অপেক্ষা করিতেছিলেন তাঁহাদের সকলকেই দীক্ষিত করিলেন। দীক্ষার পর সকলেরই নানারূপ শিক্ষা চলিতে লাগিল—কিন্তু শঙ্কর সম্বন্ধে একটু বিশেষ ব্যবস্থা হইল। বয়সের তুলনায় শঙ্কর ছোট বালক মাত্র, কিন্তু পাণ্ডিত্যে তিনি সকলেরই বড়।

যোগীবর প্রথমে শঙ্করকে হঠযোগ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। হটযোগ সাধনায় শরীর সুস্থ, সবল ও বলিষ্ঠ হয়; এক বৎসরের মধ্যে শঙ্কর এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন। দ্বিতীয় বৎসরে রাজযোগের শিক্ষা আরম্ভ হইল; এ সাধনায় মনের চঞ্চলতা দূর হয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির উপর আধিপত্য জন্মে। এই সাধনায় সিদ্ধ হইলে নানারূপ অলৌকিক শক্তিসকল লাভ করা যায় এবং অবশেষে নির্ব্বিকল্প-সমাধি প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি ও মোক্ষ লাভ করিয়া সাধকের মন আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হয়। শঙ্কর রাজযোগের সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করিলেন। তাহারপর তৃতীয় বর্ষে জ্ঞানযোগ শিক্ষা করিতে লাগিলেন। বেদান্ত, উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্যে এই শিক্ষা চলিতে লাগিল। অদ্ভুত-শক্তিসম্পন্ন বালক দেখিতে দেখিতে এ সাধানায়ও অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং অচিরেই আধ্যাত্মিক অনুভূতিসমূহের প্রকাশে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল, শান্ত ও গম্ভীরভাব ধারণ করিল।

আপন ইচ্ছায় স্থূলদেহ ত্যাগ, সূক্ষ্মদেহ ধারণ, যথাইচ্ছা গমন, দূরদৃষ্টি, দূরশ্রুতি প্রভৃতি যোগৈশ্বর্য্য তাঁহার করায়ত্ত হইল। তৃতীয় বর্ষ অতীত হইতে চলিয়াছে। গুরু দেখিলেন শঙ্করের শিক্ষা ও সাধনা শেষ হইয়াছে; তিনি আবার সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। এই সময় একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। কয়েকদিন যাবৎ অবিরত বৃষ্টি হওয়ায় নর্ম্মদায় বান ডাকিল। বানের জল চারিদিক ভাসাইয়া লইয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে জল গোবিন্দপাদ যে গুহায় অবস্থিত তাহার নিকটবর্ত্তী হইল। শিষ্যগণ বিপদের সম্ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। শঙ্কর এদিক ওদিক খুঁজিয়া একটী মাটীর কুম্ভ দেখিতে পাইলেন। তাহা তুলিয়া আনিয়া গুহামুখে স্থাপন করিয়া সকলকে নিশ্চিন্ত হইতে বলিলেন। সকলেই ব্যাপাব কি দাঁড়ায় দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। জল ভীষণ গর্জ্জন করিয়া গুহামুখ পর্য্যন্ত পৌছিল বটে, কিন্তু উত্তাল জলরাশি কি জানি কি এক আশ্চর্য্য শক্তি-বলে ঐ কুম্ভের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ও বাধা প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিল। গুরুভ্রাতাগণ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে যোগীবরের সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি শিষ্যগণের মুখে শুনিতে পাইলেন সহস্রধারা বন্যার জল শঙ্কর এক কুম্ভ মধ্যে ধরিয়া রাখিয়া তাঁহার গুহা জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিয়াছেন। যোগীবর সে কথা

শুনিয়া খুবই আনন্দিত হইলেন এবং শঙ্করকে কাছে ডাকিয়া আদর করিয়া কহিলেন, “বৎস, তোমায় আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি জগতে বহু অদ্ভুত কার্য্য করিবে। সহস্র-মুখ বানের জল যেমন তুমি একটি সামান্য কুম্ভে ধরিয়া রাখিয়াছিলে, তেমনি সকল শাস্ত্রের সার এক করিয়া তুমি বেদান্তদর্শনের এক ভাষ্য রচনা করিবে।” এইকথা বলিতে বলিতে শিষ্যের গৌরবে গুরুরমুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কিছুদিন পর শঙ্করকে কাছে ডাকিয়া যোগীবর কহিলেন, “বৎস, বল তোমার আর কি অভাব আছে?” সদ্‌গুরুর কৃপায় শঙ্করের সকল অভাবই পূর্ণ হইয়াছে। নিজের কথা নিজে বলিতে পারিতেছেন না, লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া বসিয়া আছেন। কিয়ৎকাল পরে গুরু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলে শঙ্কর ভক্তিবিনম্রস্বরে বলিলেন, “ভগবন্! আপনার কৃপায় আমার কোন অভাবই আছে বলিয়া মনে হইতেছে না। এখন শুধু এই আশীর্ব্বদ করুন, শীঘ্রই যেন ভগবৎ-চরণে মন-প্রাণ সমর্পন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারি।” গুরুদেব কহিলেন, “না বৎস, দেহসম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া মুক্তি লাভের সময় এখনও তোমার আসে নাই। জগতের মঙ্গলার্থে তোমাকে অনেক কাজ করিতে হইবে। নির্ব্বাণপ্রায় সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান করিবার জন্য শিব-অংশে তোমার জন্ম। তুমি জগতে এক নূতন তত্ত্ব—‘অদ্বৈতবাদ’ —প্রচার করিবে। তুমি এখন কাশীধামে গমন কর,

সেখানে কাশীশ্বর বিশ্বনাথ তোমাকে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া যাহা করিতে বলিবেন তাহাই করিবে। আমি আমার গুরু গৌড়পাদের নিকট তোমার সম্বন্ধে সকল কথাই জানিয়াছিলাম, এবং তাঁহারই আদেশে তোমাকে দীক্ষা দিবার জন্য সহস্র বৎসর যাবৎ দেহ ধারণ করিয়াছিলাম। আমার কাজ শেষ হইয়াছে; আমি এখন এই দেহ ত্যাগ করিয়া যাইব; তোমরা সেজন্য দুঃখিত হইও না।" এই বলিয়া যোগীবর যোগাসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং এই অনিত্য দেহ ত্যাগ করিয়া মহাসমাধিতে বিলীন হইলেন। সসীম অসীমের সহিত, বিন্দু সিন্ধুর সহিত মিলিত হইল।

তিন

গুরুর আদেশে শঙ্কর কাশী আসিলেন। কাশী হিন্দুদিগের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। বরুণা ও অসি নামক দুইটি নদী এখানে মিলিত হইয়াছে বলিয়া ইহার আর এক নাম বারাণসী। বারাণসী পতিতপাবনী জাহ্নবীতীরে অবস্থিত। কাশীধামের যে দিকেই তুমি দৃষ্টিপাত কর না কেন দেখিবে দেবমন্দির আর দেবমন্দির। এখানে শত শত মন্দিরের চূড়া মাথা উঁচু করিয়া সগৌরবে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের জয়জয়কার ঘোষণা করিতেছে। মন্দিরগুলির মধ্যে বিশ্বনাথের মন্দির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তারপরই অন্নপূর্ণা মন্দিরের নাম করা যায়। কাশীর দেবমন্দিরের নামের কি শেষ আছে? প্রতিদিন সহস্র সহস্র নরনারী বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা এবং মন্দিরে মন্দিরে অন্যান্য দেবদেবী দর্শন করিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় এই সব মন্দিরে মন্দিরে যখন আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠে তখন হিন্দুমাত্রেরই হৃদয় ভগবৎ প্রেমে পূর্ণ হইয়া উঠে।

কাশীর গঙ্গাতীরে শত শত ঘাট, তন্মধ্যে মনিকর্ণিকা ও দশাশ্বমেধ শ্রেষ্ঠ। প্রতিঘাটে শত শত নরনারী স্নান করিতেছে, পূজা করিতেছে, তর্পণ করিতেছে, কত রকমের স্তব

সুললিতস্বরে পাঠ করিতেছে এবং সেই ভক্তিবিগলিত মধুর স্তব আকাশ বাতাস পবিত্র করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে।

হিন্দুর শাস্ত্র অনন্ত। শাস্ত্রপাঠ করিতে চাও, কাশীধামই তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্র। কাশীর গলিতে গলিতে বড় বড় পণ্ডিতগণ টোল খুলিয়া দিবারাত্র শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন। দেশ বিদেশ হইতে কত ছাত্র শাস্ত্রালোচনার জন্য প্রতিদিন এখানে আসিতেছে, আবার কতজন শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া প্রতিদিন স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কাশীর পথে, অলিতে গলিতে, মন্দিরে মন্দিরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শত শত সাধু সন্ন্যাসী তোমার নয়ন পথে পতিত হইবে।

কাশীতে দুইটি শ্মশান রহিয়াছে—একটি মনিকর্ণিকা-ঘাট, অপরটি হরিশ্চন্দ্র-ঘাট। মনিকর্ণিকা কাশীর মহাশ্মশান; দিবা-রাত্র সেখানে চিতা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। কত বালক, বৃদ্ধ ও যুবার সুন্দর সুকোমল দেহ পুড়িয়া ছাই হইতেছে। কত রাজা মহারাজা, ধনী নির্ধন শেষদিনে একই চিতা-শয্যায় শায়িত হইতেছে। শ্মশানের এ দৃশ্য যেন আপনা হইতেই শঙ্করের নিম্নোদ্ধৃত সুপ্রসিদ্ধ মোহমুদ্গর স্তোত্রটি মনে করাইয়া দেয়।

(১)

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং
কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজ কর্ম্মোপাত্তং
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্॥

(২)

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীববিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥

(৩)

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥

(৪)

নলিনীদলগতজলমতিতরলং
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥

(৫)

তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে
পরিহর চিন্তাং নশ্বরবিত্তে।
বিদ্ধি ব্যাধিব্যালগ্রস্তং
লোকং শোকহতং চ সমস্তম্॥

(৬)

যাবজ্জননং তাবন্মরণং
তাবজ্জননীজঠরে শয়নং।
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥

(৭)

দিনযামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ
শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥

(৮)

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম্ ॥

(৯)

সুরবরমন্দিরতরুমূলবাসঃ
শয্যাভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ
কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥

(১০)

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ
মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং
বাঞ্ছস্যচিরাদ্‌যদি বিষ্ণুত্বম্‌॥

(১১)

অষ্টকুলাচলসপ্তসমুদ্রাঃ
ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ।
নত্বং নাহং নায়ং লোকঃ
তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥

(১২)

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ
ব্যর্থং কুপ্যসি মধ্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানং
সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানং॥

(১৩)

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ
তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥

(১৪)

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ॥

(১৫)

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্তঃ
তাবন্নিজপরিবারোরক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে
বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে।

(১৬)

কামং ক্রোধং লোভং মোহং
ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যতি কোঽহং।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াঃ
তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়া॥

হরিশ্চন্দ্র-ঘাটেও প্রতিদিন কত চিতা, কত জনের কত সাধ, কত আকাঙ্ক্ষার শেষ পরিণাম ঘোষণা করিতেছে। এই সেই শ্মশান ঘাট, যে স্থানে রাজা হরিশ্চন্দ্র আপন সত্য রক্ষার জন্য শ্মশান-চণ্ডাল সাজিয়া চণ্ডালের কাজ করিয়াছিলেন। এই সেই ঘাট, যাহার বায়ুমণ্ডল আজও বুঝি পুত্রশোকাতুরা শৈব্যার করুন ক্রন্দনে ভারাক্রান্ত হইয়া

রহিয়াছে। এখানেই আবার রাজা হরিশ্চন্দ্র সত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিতাশয্যায় শায়িত মৃত পুত্রের জীবন এবং হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া জগতে অনন্ত কালের জন্য সত্যের মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

শঙ্কর কাশী আসিয়াছেন; কাশী আসিয়া মণিকর্ণিকার নিকটবর্ত্তী স্থানে আসন স্থাপন করিলেন। ফুল ফুটিলে তাহার গন্ধ যেমন লুকাইয়া রাখা যায় না, শঙ্করের পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও গোপন রহিল না। কাশীর ঘাটে ঘাটে, অলিতে গলিতে, মন্দিরে মন্দিরে, সকলেরই মুখে বালক শঙ্করের পাণ্ডিত্যের কথা। প্রতিদিন শত শত পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন, বালক, বৃদ্ধ ও যুবা দলে দলে চলিয়াছে শঙ্করকে দেখিতে। যাহারা তাঁহার নিকট আসিল, তাহারাই মুগ্ধ হইল—কেহ বা তাঁহার বৈরাগ্যোজ্জ্বল অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া—আবার কেহ বা তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া।

শঙ্করের বয়স এখন বার বৎসর মাত্র। বার বৎসরের বালকের মুখে ধর্ম্মের কথা শুনিয়া, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বালক শাস্ত্রের এক নূতন ব্যাখ্যা দিতেছেন বলিয়া অনেকেই মনে করিতে লাগিলেন, কিন্তু শঙ্কর তাহা স্বীকার করিলেন না। তিনি বলিলেন, যে ব্যাখ্যা তিনি প্রদান করিতেছেন, তাহাই শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা, শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ, এবং ইহারই নাম "অদ্বৈতবাদ"।

সারা জগতে একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন। সাধারণভাবে আমরা সর্ব্বত্র ব্রহ্ম থাকা সত্বেও তাঁহাকে দেখিতে পাই না; দেখিতে না পাওয়ার কারণ আমাদের অজ্ঞানতা। এই যে আমরা যত কিছু দেখিতেছি, যত কিছু শুনিতেছি, সে সবই মিথ্যা—সে সবই অনিত্য। রাত্রির অন্ধকারে যেমন আমরা অপর কিছুকে ভূত মনে করিয়া ভয় পাই, কিন্তু আলো লইয়া গেলে আর সে ভয়ের কারণ থাকে না—অন্য কিছুই দেখিতে পাইনা, শঙ্করের মতে আমরা যে জগৎ দেখিতেছি তাহাও ঠিক তেমনি। অজ্ঞানান্ধকারে আমাদের চোখ আবৃত আছে বলিয়াই আমরা জগৎকে দেখিতেছি এত বিভিন্ন আকারে; যেদিন আমাদের এই অজ্ঞানরূপ অন্ধকার ঘুচিয়া যাইবে, আমাদের মধ্যে জ্ঞানের আলোক প্রজ্জ্বলিত হইবে, সেদিন আর তত বিভিন্নতা থাকিবে না—'আমি', 'তুমি' ভেদজ্ঞান থাকিবে না—দেখিবে এক ব্রহ্ম ছাড়া জগতে আর কিছুই নাই। একমাত্র ব্রহ্মই সর্ব্বত্র সমভাবে রহিয়াছে, কাজেই 'সুখ', 'দুঃখ', 'আমি', 'তুমি' সকলই মনের ভ্রম মাত্র। বালক শঙ্করের মুখে শাস্ত্রের এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া অনেকেই আপত্তি তুলিল, কতজনে কত তর্ক করিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বালক শঙ্করের নিকট সকলকেই পরাজিত হইতে হইল।

শঙ্কর প্রতিদিনই গঙ্গাস্নান করেন এবং অন্নপূর্ণা ও বিশ্বনাথ দর্শন করেন। দিনের অবশিষ্ট সময় শাস্ত্রালোচনায়

অতিবাহিত করেন। কালক্রমে অনেকেই 'অদ্বৈত' মত গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিলেন। শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে 'অদ্বৈত' মত অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ লিখিতে বলিলেন,—কিন্তু শঙ্কর নিরুত্তর থাকেন, কিছুই বলেন না। গুরুদেব বলিয়াছেন, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ দর্শন দিয়া যাহা করিতে বলিবেন তিনি যেন তাহাই করেন; কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত বাবা বিশ্বনাথের সাক্ষাৎ দর্শন বা আদেশ কিছুই পান নাই। কাজেই গ্রন্থ লিখেন কি করিয়া!

কাশীতে ধর্ম্মলাভের জন্য, শাস্ত্রজ্ঞানের জন্য দেশ বিদেশ হইতে বহু লোক আসিয়া থাকে, সে কথা আমরা বলিয়াছি। এই সময় চোলদেশীয় এক ব্রাহ্মণকুমার সদ্‌গুরুলাভের আশায় নানা দেশ ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হন। শঙ্করের গুণের কথা ও পাণ্ডিত্যের কথায় কাশীর আকাশ বাতাস তখন ভরিয়া আছে। কাশী-ধামে আসিয়াই ব্রাহ্মণকুমার শঙ্করের কথা শুনিতে পাইলেন। ব্রাহ্মণকুমারের নাম সনন্দন। সনন্দন যাইয়া শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইলেন। সনন্দন পণ্ডিত ও চরিত্র-বান্। অল্প সময়েই উভয়েই উভয়কে আপনার করিয়া লইলেন,—সনন্দনই শঙ্করের প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য হইলেন।

শঙ্কর একদিন শিষ্যগণ সহ মণিকর্ণিকার সরু পথ ধরিয়া গঙ্গাস্নানে চলিয়াছেন। পথিমধ্যে এক যুবতী মৃত পতির

মস্তক কোলে লইয়া পথ জুড়িয়া বসিয়া আছে। কাজেই তাঁহাকে থামিতে হইল,—তিনি যুবতীকে মৃতদেহটি সরাইয়া রাস্তা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া যুবতী কহিলেন,—"আপনিই কেন শবটাকে রাস্তা হইতে সরিয়া যাইতে বলুন না ?" শঙ্কর যুবতীর কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "এ কি বলিতেছেন মাতঃ! শব কি করিয়া রাস্তা ছাড়িয়া দিবে ? ইহার কি নড়িবার চড়িবার শক্তি আছে ?" যুবতী বলিলেন, "কেন ? আপনি আজ আবার এ কি বলিতেছেন ? আপনিই না বলেন শক্তিহীন নির্গুণ ব্রহ্মই জগতে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। যদি তাহাই সম্ভব, তবে শক্তিহীন শব রাস্তা ছাড়িয়া সরিয়া যাইতে পারিবে না কেন ?" এই কথা বলিয়াই যুবতী মৃত পতিসহ কোথায় অন্তর্হিত হইলেন, শঙ্কর আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। শঙ্কর তখন বুঝিলেন যে, তাঁহার ভুল সংশোধন করিবার জন্যই মাতা অন্নপূর্ণা কৌশলে এই উপদেশ দিয়া গেলেন।

অন্য একদিন শঙ্কর সশিষ্য গঙ্গাস্নানে চলিয়াছেন। তিনি দেখিলেন এক চণ্ডাল কতকগুলি কুকুর লইয়া মণিকর্ণিকার ঘাটের পথ জুড়িয়া বিপরীত দিক হইতে আসিতেছে। ব্রাহ্মণেরা চণ্ডালাদি নীচ জাতিকে অত্যন্ত অস্পৃশ্য জ্ঞান করেন। ব্রাহ্মণ শঙ্করের সেই আজন্ম আচরিত সংস্কার এখনও দূর হয় নাই। কাজেই শঙ্কর

দূর হইতে চণ্ডালকে বলিলেন, "ওহে বাপু! কুকুরগুলিকে একদিক করিয়া যাতায়াতের রাস্তা করিয়া দাও।" চণ্ডাল যেন খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল, "সে কি? আপনিই না এক ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় বস্তু কিছুই নাই প্রচার করিতেছেন? এক ব্রহ্ম ছাড়া যদি দ্বিতীয় বস্তু না থাকে, তবে কুকুরেরই বা অস্তিত্ব কোথায়? আর কুকুর-স্পর্শে আপনার অপবিত্র বা অশুচি হইবারই বা কারণ কি আছে? আপনার মতে একমাত্র নিত্য বস্তু ব্রহ্ম শুদ্ধ ও পবিত্র। যাহা চিরপবিত্র তাহা কখনও অপবিত্র হইতে পারে কি? সূর্য্যরশ্মি গঙ্গাজলেই পতিত হউক, অথবা সুরাপাত্রে প্রতিবিম্বিত হউক, তাহাতে কি আসে যায়?" চণ্ডালের মুখে বেদান্তের কথা শুনিয়া শঙ্কর চমকিয়া উঠিলেন। চণ্ডাল এই অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান কোথায় পাইল? শঙ্কর তখন আপন ভুল বুঝিলেন। তিনি যাহা প্রচার করিতেছেন, কার্য্যে তিনি তাহা পালন করিতে পারেন না,—এইখানেই যে তাঁহার ত্রুটি রহিয়াছে তাহা তিনি বুঝিলেন। শঙ্কর তখন চণ্ডালকে গুরুজ্ঞানে দণ্ডবৎ করিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন। বাবা বিশ্বনাথই চণ্ডালবেশে শঙ্করের ভুল সংশোধন করিতে আসিয়াছেন। শঙ্করের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি নিজরূপ ধারণ করিয়া কহিলেন, "বৎস, এতদিনে তোমার শিক্ষা সমাপ্ত হইল। তুমি বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্য রচনা কর। জগতে অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের জয়জয়কার

ঘোষণা কর।" এই বলিয়া বিশ্বনাথ অন্তর্হিত হইলেন। শঙ্কর বুঝিলেন তাঁহার ভাষ্য লিখিবার সময় আসিয়াছে।

কিছুদিন যাবৎ শঙ্কর ভাষ্যরচনার কথা ভাবিতেছেন। ভাবিতে ভাবিতে হিমালয়ের ক্রোড়ে বদরিকাশ্রমের কথা তাঁহার মনে হইল। ব্যাসদেব বদরিকাশ্রমের এক গুহায় বসিয়া মহাভারত রচনা করেন। সে গুহার নাম ব্যাসগুহা। শঙ্কর তীর্থরাজ বদরীনারায়ণের ব্যাসগুহাই ভাষ্য রচনার উপযুক্ত স্থান বলিয়া স্থির করিলেন।

আজকাল দেশের প্রায় অনেক স্থানেই রেল হইয়াছে। তখনকার দিনে রেল ছিল না। কাশী হইতে শঙ্কর সশিষ্য পদব্রজে গঙ্গার তীরে তীরে বদরীনারায়ণের দিকে চলিতে লাগিলেন। বহুদিন পথ চলিয়া অসংখ্য গ্রাম, নগর ও প্রান্তর অতিক্রম করিয়া, বহু পাহাড় ও পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া শঙ্কর হরিদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে হৃষীকেশে আসিলেন। হৃষীকেশে বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করিয়া শঙ্কর দেখিলেন মন্দির বিগ্রহশূন্য। কিছুদিন পূর্ব্বে চীন দস্যু কর্ত্তৃক মন্দির আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনায় বিগ্রহটিকে গঙ্গাগর্ভে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর হইতে আর সে বিগ্রহ পাওয়া যাইতেছে না। ঘটনাটি শুনিয়া শঙ্করের মনে দুঃখ হইল। যাহাহউক, কিয়ৎকাল ধ্যানমগ্ন থাকিয়া তিনি একটা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া কহিলেন, "ঐ স্থানে খোঁজ করিলে বিগ্রহটি পাওয়া যাইবে।" তাঁহার কথা শুনিয়া সেখানকার

লোকজনের আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারা নির্দ্দেশিত স্থান হইতে বিগ্রহটি তুলিয়া আনিয়া মন্দিরে স্থাপন করিল। আনন্দ উৎসবে হিমালয়ের শান্তিময় ক্রোড় মুখরিত হইয়া উঠিল। শঙ্করের প্রশংসা ও খ্যাতি লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইতে লাগিল। যাহাহউক, তাঁহার ধর্ম্ম-সংস্কারের কার্য্য আরম্ভ হইল।

হৃষীকেশ ত্যাগ করিয়া শঙ্কর লছমনঝোলা, দেবপ্রয়াগ, শ্রীক্ষেত্র, শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, জ্যোতির্ধাম, বিষ্ণুপ্রয়াগ, ধবলগঙ্গা, ব্রহ্মকুণ্ড, শিবকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড, গণেশতীর্থ প্রভৃতি কত শত তীর্থ অতিক্রম করিতে করিতে অবশেষে বদরিকাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বদরিকাশ্রমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত। অচল, অটল হিমালয়ের সুমহান্ দৃশ্য, তাহার অভ্রভেদী তুষার-ধবল শৃঙ্গাবলী দেখিয়া সকলেরই মনপ্রাণ বিমোহিত হয়।

বদরিকাশ্রমে পৌঁছিয়া সশিষ্য শঙ্কর নারায়ণ-মূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখেন এখানেও মন্দির বিগ্রহশূন্য; কেবল একটি শালগ্রাম শিলা মন্দিরে পূজিত হইতেছে। মূর্ত্তি কোথায় গেল জিজ্ঞাসা করা হইলে সেই পুরাণ ইতিহাস কথিত হইল—ধর্ম্মদ্বেষী বিধর্ম্মীদের হাত হইতে বিগ্রহটিকে রক্ষা করিবার জন্য লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর হইতে আর সেটিকে পাওয়া যাইতেছে না। শঙ্কর কিয়ৎকাল কি চিন্তা করিলেন,

তাহারপর নিকটবর্ত্তী নারদকুণ্ডে যাইয়া নামিলেন। কুণ্ডের জলে ডুব দিয়া আচার্য্য শঙ্কর নারায়ণ মূর্ত্তি লইয়া তীরে উঠিলেন। মূর্ত্তি চতুর্ভুজ, পদ্মাসনে উপবিষ্ট, কিন্তু মূর্ত্তির হস্তের কয়েকটি অঙ্গুলি ভগ্ন। শঙ্করের মনে সন্দেহ হইল বদরীনারায়ণের মূর্ত্তি কখনও ভগ্নহইতে পারে না; এই মনে কবিয়া মূর্ত্তিটি পুনরায় জলে নিক্ষেপ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় তিনি দৈববাণী শুনিতে পাইলেন,—"বৎস! ইহাই বদরীনারায়ণের মূর্ত্তি।" তাঁহার সকল সন্দেহ দূর হইল এবং তখন তিনি নিজেই কাঁধে করিয়া বিগ্রহটিকে মন্দিরে লইয়া আসিলেন। তথাকার অধিবাসিগণ তখন মহা ধুমধামের সহিত বিগ্রহের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিল।

শঙ্কর এইবার ভাষ্যরচনায় মন দিবেন স্থির করিলেন। মন্দিরের অল্পদূরেই ব্যাসগুহা। ঐ স্থানকে ব্যাসতীর্থ বলা হয়। গুহার দুইদিকে দুইটি মন্দিব—একদিকে সিদ্ধিদাতা গণপতির মন্দির, অন্যদিকে বিদ্যাদাত্রী সরস্বতীদেবীর মন্দির। উভয় মন্দিরের মধ্যস্থিত গুহা ভাষ্যরচনার উপযুক্ত স্থানই বটে। জ্যোতির্ধামের রাজা শঙ্করের ভাষ্যরচনার কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার সকল রকম সুবিধা-অসুবিধা দেখিবার ভার নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন। শঙ্কর সশিষ্য ব্যাসগুহায় আশ্রয় লইয়া ভাষ্যরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আচার্য্য শঙ্কর চারি বৎসর ব্যাসগুহায় বাস করিয়া বেদান্তদর্শন এবং অপর কয়েকখানি গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিলেন।

ব্যাসদেব ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব—এই চারি বেদ, অষ্টাদশ পুরাণ, এবং অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন। বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—এক ভাগ জ্ঞানকাণ্ড, অপর এক ভাগ কর্ম্মকাণ্ড। বেদের জ্ঞানভাগ লইয়াই উপনিষদ্ রচিত হইয়াছে। উপনিষদ্ বহু, তন্মধ্যে ১০৮ খানা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। বেদের যে ভাগে যাগ, যজ্ঞ, পূজা, হোম, বলি প্রভৃতির বিধি ও তাহার মন্ত্রাদি রহিয়াছে, তাহাই বেদের কর্ম্মকাণ্ড। ব্যাসদেব এক সময় ভাবিলেন এত শাস্ত্র পড়িয়া শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হওয়া সাধারণের পক্ষে খুবই কঠিন; অতএব এমন যদি একখানা গ্রন্থ লিখিতে পারা যায় যাহাতে সমস্ত শাস্ত্রের সার নিহিত থাকিবে তাহা হইলে বেশ সুবিধা হয়। এই মনে করিয়া তিনি সমস্ত শাস্ত্রের সার স্বরূপ 'বেদান্তদর্শন' বা 'ব্রহ্মসূত্র' রচনা করিলেন।

ব্যাসদেব তো সকলের সুবিধার জন্য বেদান্তদর্শন লিখিয়াছিলেন, কিন্তু কালক্রমে ইহার অর্থ এবং ব্যাখ্যা লইয়া গোলযোগ আরম্ভ হইল। নানা জনে ইহার নানা রকম ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। নানা জনের নানা মতের মীমাংসা করিয়া সমস্ত শাস্ত্রার্থের সামঞ্জস্য রাখিয়া বেদান্ত-দর্শনের যথার্থ অর্থ কি তাহাই বুঝাইবার জন্য শঙ্কর উহার ভাষ্য রচনা করিলেন। আচার্য্য শঙ্কর বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য রচনা করিতে যাইয়া শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের সাহায্যে বেদান্তদর্শনের অর্থ তিনি যেরূপ বুঝাইয়াছিলেন,

তাহাই 'ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য' নাম দিয়া বর্ণনা করিলেন। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে তিনি প্রমাণ করিলেন যে, একমাত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই সত্য, ইহা ছাড়া আর সবই মিথ্যা মায়া। ইহারই নাম 'অদ্বৈতবাদ'। আচার্য্য শঙ্কর চারি বৎসরে বেদান্তদর্শন, শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা, ঈশ, কঠ, কেন প্রভৃতি বারখানি উপনিষদ্, বিষ্ণুসহস্রনাম এবং সনৎসুজাতীয়-সংবাদ প্রভৃতি ষোলখানি গ্রন্থের ভাষ্য লিখিলেন।

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্ব হইতে 'বিষ্ণুসহস্রনাম' এবং উদ্যোগ-পর্ব্ব হইতে 'সনৎসুজাতীয়-সংবাদ' গ্রহণ করা হইয়াছে। 'শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা'ও মহাভারতের অংশ—ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত।

আচার্য্য ভাষ্যরচনার সঙ্গে সঙ্গেই শিষ্যগণকে তাহা পড়াইতেন। সকল শিষ্যই পড়িত, কিন্তু সনন্দন একটু বেশী পড়িত। আচার্য্যও অন্য শিষ্যদের অপেক্ষা তাহার অধিক আগ্রহ ও শক্তি দেখিয়া তাহাকে একটু বেশী পড়াইতেন। কাজেই অন্যান্য শিষ্যদের মনে ঈর্ষা দেখা দিল ; সকলেই ভাবিল গুরু সনন্দের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিতেছেন। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই ? গুরুর বিদ্যাদানেই আনন্দ, তাঁহার কাজ বিদ্যাদান বা জ্ঞানদান। শিষ্যদের মধ্যে গুরু সমভাবেই বিদ্যাদান করেন ; প্রত্যেক শিষ্য স্ব স্ব শক্তি অনুসারে তাহা গ্রহণ করে, এবং যে শিষ্য অধিক শক্তিমান্, সে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গ্রহণ করে এবং সেই কারণেই ক্রমশঃ গুরুর অধিক প্রিয়পাত্র হইয়া

উঠে। কিন্তু তাই বলিয়া অন্য শিষ্যদের প্রতি যে গুরুর ভালবাসা থাকে না তাহা নহে। শিষ্য যে গুরুর অধিক প্রিয়পাত্র হয় তাহা তাহার নিজেরই গুণে। সহপাঠিগণ সব সময় একথা বুঝিতে পারে না, আর বুঝিতে পারে না বলিয়াই তাহাদের মধ্যে কেহ যদি গুরুর অধিক প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে, তবে সেখানে তাহারা গুরুর পক্ষপাতিত্ব ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পায় না।

শঙ্কর সনন্দন সম্বন্ধে অন্যান্য শিষ্যদের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন এবং সকলের ভ্রম যাহাতে দূর হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করিলেন।

তাঁহাদের আশ্রমের নিকট দিয়া অলকানন্দা নদীটি বহিয়া যাইতেছে। অলকানন্দা অল্প পরিসর, কিন্তু পার্ব্বত্য নদী বলিয়া উহাতে ভীষণ স্রোত। কোন কার্য্যোপলক্ষে এক-দিন সনন্দন নদীর অপর পারে গিয়াছেন। আচার্য্য বুঝিলেন শিষ্যদিগের ভ্রম দূর করিবার ইহাই উপযুক্ত অবসর। তিনি যেন খুবই বিপদে পড়িয়াছেন, এইরূপ স্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, "সনন্দন! সনন্দন! শীঘ্র এখানে এস, শীঘ্র এখানে এস।" অপর পার হইতে সনন্দন গুরুর সেই আহ্বান শুনিতে পাইলেন। গুরুদেবের নিশ্চয় কোন বিপদ ঘটিয়াছে মনে করিয়া ক্ষণমাত্র বিলম্ব ব্যতিরেকে সেই ভীষণ পার্ব্বত্য খরস্রোতা নদীর ব্যবধান লক্ষ্য না করিয়াই সনন্দন আচার্য্যের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতে

লাগিলেন। প্রাণ থাকিবে কি যাইবে সেদিকে তাঁহার মোটেই খেয়াল নাই। কি করিয়া অতি সত্বর গুরুর নিকট পৌঁছান যায়—তাহাই তখন তাঁহার একমাত্র চিন্তা। কিন্তু গুরুভক্তের কি বিনাশ আছে? নদীর মধ্যে সনন্দনের প্রতি পদক্ষেপে এক একটি করিয়া পদ্মফুল উৎপন্ন হইতে লাগিল। সনন্দন সেই পদ্মফুলগুলির উপর ভর দিয়া নদী পার হইয়া অনতিবিলম্বে শ্রীগুরুচরণে উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য শিষ্যগণ আচার্য্যের নিকট দাঁড়াইয়া সনন্দনের নদী অতিক্রম করিবার সময় তাঁহার প্রতি পদক্ষেপে পদ্মফুল ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল। সনন্দন কাছে আসিলে আচার্য্য অন্যান্য শিষ্যদের সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ বৎসগণ! জননী ভগবতীর সনন্দনের প্রতি কি কৃপা! আজ হইতে তোমরা উহাকে "পদ্মপাদ" বলিয়া ডাকিও।" অন্যান্য শিষ্যগণ এইবার তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিল। গুরুভক্তির মহিমা বাস্তবিকই কি অপার!

শিষ্যগণের ভাষ্যপাঠ শেষ হইল। সকলে এইবার গুহার বাহিরে আসিলেন। এই নূতন মতবাদ—"অদ্বৈতবাদ"—জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে বহুল প্রচারিত হয়, শিষ্যগণের ইহাই আন্তরিক ইচ্ছা। আচার্য্যের নিজের কোন ইচ্ছা নাই,—শিষ্যদের ইচ্ছাই এখন তাঁহার ইচ্ছা। বদরিকাশ্রম ত্যাগ করিয়া তাঁহারা জ্যোতির্ধামে আসিলেন। জ্যোতির্ধামের রাজা

তাঁহাদের সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা আচার্য্যের গুণে মুগ্ধ হইয়া যাহাতে তাঁহার ধর্ম্মমত সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আচার্য্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত রাজা ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। যে সকল মন্দির হইতে পূজাপাঠ লুপ্ত হইয়াছিল, সে সকল মন্দিরে তাহার পুনঃ প্রবর্ত্তন হইল।

জ্যোতির্ধাম হইতে আচার্য্য কেদারনাথ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কেদারনাথে কেদারেশ্বর নামক শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। এখানে ভীষণ শীত। সেই বরফের রাজ্যে শিষ্য-দের বড় কষ্ট হইতেছে দেখিয়া আচার্য্য একটা স্থান দেখাইয়া কহিলেন, "ঐ স্থানে গরম জলের ঝরণা রহিয়াছে।" তাঁহার কথামত গরম জলের ঝরণা পাওয়া গেল। ঝরণাটি পূর্ব্ব হইতেই ঐখানে ছিল, না শিষ্যদের কষ্ট নিবারণ করিবার জন্য আচার্য্য যোগবলে তপ্ত বারি ধারা সৃজন করিলেন তাহা বলা বড় কঠিন।

প্রায় এক মাস এখানে বাস করিয়া তাঁহারা গোমুখীতে উপস্থিত হইলেন। গোমুখী হইতেই পুণ্যতোয়া গঙ্গার উৎপত্তি। এই স্থানটির আকৃতি গোমুখের ন্যায় বলিয়া ইহার নাম গোমুখী হইয়াছে। এস্থান চিরতুষারাবৃত। গোমুখী হইতে তাঁহারা গঙ্গোত্রী আসিলেন। এখানে আচার্য্য শিবলিঙ্গ ও গঙ্গাদেবীর মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। তিনি নিয়ম করিলেন সাধারণ তীর্থযাত্রী যাঁহারা গোমুখী পর্য্যন্ত

যাইতে পারিবেন না, তাঁহারা এখান পর্য্যন্ত আসিলেই গোমুখী দর্শনের ফললাভ করিবেন।

গঙ্গোত্রী হইতে শঙ্কর কাশীধামে ফিরিয়া আসিলেন। কাশীতে ফিরিয়া আসিবার পর আচার্য্য প্রায় সব সময়ই ধ্যানস্থ থাকিতেন। আচার্য্যের বর্ত্তমান অবস্থা দর্শন করিয়া শিষ্যগণ চিন্তিত হইলেন,—ভাবিলেন, বুঝিবা আচার্য্য আর অধিক দিন দেহ রাখিবেন না। কি করিয়া আচার্য্যের মন বাহ্য জগতে ফিরাইয়া আনা যায়, সেজন্য পদ্মপাদ প্রভৃতি শিষ্যগণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। বহু চিন্তার পর তাঁহারা আচার্য্যের নিকট পুনরায় ভাষ্য পড়িতে সুরু করিলেন, এবং ভাবিলেন ইহাতে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। দৈবও আবার তাঁহাদের অনুকূল হইল।

একদিন আচার্য্য শিষ্যগণকে পড়াইতেছেন, এমন সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ শিষ্যদের লক্ষ্য করিয়া এখানে বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকার কে আছেন জানিতে চাহিলেন। শিষ্যগণ আচার্য্যকে দেখাইয়া দিলেন। আচার্য্য সাদর-অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। ব্রাহ্মণ আসন গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনের ভাব,— এতো দেখিতেছি নেহাৎ বালক মাত্র; বালকের লিখিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য! সে ভাষ্যই বা কি হইবে, আর তার মূল্যই বা কি? ব্রাহ্মণের কথাবার্ত্তা, হাবভাবে যেন ইহাই প্রকাশ পাইতেছিল। যাহাহউক দু'জনের মধ্যে শাস্ত্রালোচনা

আরম্ভ হইলে ব্রাহ্মণ প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন, "বেদান্ত-দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম সূত্রের অর্থ কি?" আচার্য্য তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন। ব্রাহ্মণ তর্ক তুলিলে আচার্য্য তাহারও মীমাংসা করিলেন। এইরূপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিচার চলিল। অনেক বেলা হইয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ সেদিন বিদায় লইলেন। পরদিন পুনরায় বিচার আরম্ভ হইল; ক্রমান্বয়ে সাতদিন বিচার চলিল,—কিন্তু কেহই কাহারও নিকট পরাজিত হইলেন না। অষ্টম দিন বিচার আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই পদ্মপাদের কথায় আচার্য্য ব্রাহ্মণকে কহিলেন, "দেখুন, আমার এই শিষ্যটি কহিতেছে, স্বয়ং ব্যাসদেবই ছদ্মবেশে আমার সঙ্গে বিচার করিতেছেন, নতুবা এ পাণ্ডিত্য, এ বিচারশক্তি অন্যে সম্ভবে না। অতএব আগে আপনার পরিচয় দিন, তারপর বিচার আরম্ভ হইবে।" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এইবার ধরা পড়িলেন এবং হাসিতে হাসিতে স্বীকার করিলেন তিনিই ব্যাসদেব। সকলেই এইবার তাঁহার চরণে পড়িয়া প্রণাম করিলেন। বিচার বন্ধ হইল। ব্রহ্মসূত্র তাঁহারই রচনা; তাহারই ভাষ্য আচার্য্য করিয়াছেন। উক্ত ভাষ্য নির্ভুল করিবার অভিপ্রায়ে তিনি ব্যাসদেবের হস্তে সমগ্র ভাষ্যখানি দিলেন। তিনি ভাষ্যখানি পাঠ করিয়া খুবই খুসী হইলেন এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা খুবই উপযুক্ত হইয়াছে বলিলেন। তারপর ব্যাসদেব উপনিষদ্ ও গীতা এই প্রস্থানদ্বয়ের ভাষ্য রচনা করিবার জন্য

শঙ্করকে অনুরোধ করিলেন। আচার্য্য আগেই সেগুলি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া সেগুলি ব্যাসদেবের হস্তে দিলেন। সে ভাষ্যগুলি দেখিয়া তিনি আরও অধিক প্রীত হইলেন। এই সব কথাবার্ত্তা শেষ হইলে পর আচার্য্য কহিলেন, "ভগবন্! আমার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে; অতএব শীঘ্রই যাহাতে এই দেহ ত্যাগ করিয়া পরমব্রহ্মে বিলীন হইতে পারি সেজন্য আশীর্ব্বাদ করুন।" ব্যাসদেব উত্তর করিলেন, —"না বৎস! জগতে তোমার কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। তোমার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে তাহা আমি জানি এবং সে জন্যই তোমাকে আবও আয়ুঃ দান করিবার জন্য আমি আসিয়াছি। আমার বরে তুমি আরও ষোল বৎসর কাল অধিক বাঁচিবে। তুমি প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য লিখিয়াছ সত্য, কিন্তু এখনও তাহার প্রচার করিয়া সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কর নাই। দেশে এখনও বহু অবৈদিক সম্প্রদায় ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, সত্যের নামে মিথ্যা, প্রচার করিয়া লোকসাধারণকে ধর্ম্মচ্যুত করিতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত না ঐ সকল সম্প্রদায়কে বিচারে পরাজিত করিয়া সত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবে ততদিন পর্য্যন্ত তোমার কাজ শেষ হয় নাই জানিবে। ভট্টপাদ কুমারিল প্রভৃতি মনীষিগণের চেষ্টায় অবৈদিক বৌদ্ধধর্ম্ম নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে এবং বৈদিক মতের প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে বটে, কিন্তু বিশুদ্ধ বেদান্ত মতের এখনও প্রচার হয় নাই। অতএব অচিরে দিগ্বিজয়ে

বহির্গত হও এবং সর্ব্বপ্রথমে কর্ম্মবাদী ভট্টপাদ কুমারিলকে বিচারে পরাজিত করিয়া স্বমতে আনয়ন কর এবং পরে ভারতের অন্যান্য পণ্ডিতগণকে একে একে পরাজিত করিয়া বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা কর।" এই কথা বলিয়া ব্যাসদেব অন্তর্দ্ধান করিলেন। শিষ্যগণের আনন্দ আর ধরে না; আরও ষোল বৎসর কাল আচার্য্যকে দেহ ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে।

চার

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে কপিলাবাস্তুর রাজভবনে এক বালকের জন্ম হয়। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের নাম রাখিলেন শাক্যসিংহ। তাহার আর এক নাম হইল গৌতম বালকের বয়স বাড়িতে লাগিল, কিন্তু দেখা গেল তাহার প্রকৃতি অন্যান্য সাধারণ বালকের মত নহে। গৌতম খেলাধূলা ভালবাসেন না, অধিকাংশ সময় নির্জ্জনে বসিয়া কি চিন্তা করেন। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই গৌতম কি জানি কি এক অজানা বস্তুর জন্য আকুল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। রাজভবনের আমোদ-প্রমোদ কিছুতেই রাজপুত্রের মনে কোন আনন্দ দিতে পারিল না। অবশেষে গৌতম বুঝিলেন মানুষ সুখের আশায় ঘরবাড়ী, স্ত্রীপুত্র বা রাজ্যপাট লইয়া যে খেলার ঘর পাতিয়া থাকে তাহা দু'দিনের—দু'দিন যাইতে না যাইতেই সে খেলার শেষ হইয়া যায়। গৌতমের পক্ষে এই দু'দিনের সুখ ভোগে—ক্ষণস্থায়ী সাংসারিক আনন্দে—ভুলিয়া থাকা সম্ভব হইল না। তাঁহার মনে হইল সুখভোগই যদি করিতে হয়, তবে চিরস্থায়ী সুখভোগ করিতে

হইবে। রাজভবনের অতুল ঐশ্বর্য্য, অগণিত দাসদাসী, চব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় আহার্য্য এবং দুগ্ধফেননিভ শয্যা তাঁহার নিকট বিষবৎ অপ্রিয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কাজেই ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে রাজপুত্র প্রকৃত সুখের অন্বেষণে একদিন গভীর নিশীথে কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতা, সেবাপরায়ণা ও সাধ্বী স্ত্রী, প্রাণপ্রিয় পুত্র এবং সকল সুখের আধার রাজ-ভবন ত্যাগ করিয়া পথের ফকির সাজিলেন।

গৃহ ছাড়িয়া গৌতম প্রথমে রাজগৃহ নামক স্থানে গমন করিলেন এবং সেখানে এক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট বহু শাস্ত্র পড়িলেন। শাস্ত্রপাঠ শেষ হইলে গৌতম দেখিলেন যে, যে উদ্দেশ্যে তিনি সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছেন, শাস্ত্রে তাহার সন্ধান পাওয়া কঠিন। তখন তিনি গয়ার নিকট এক অতি সুন্দর নির্জ্জন স্থানে সাধনায় বসিলেন। তাঁহার সে সাধনা—সে সঙ্কল্প—বড় কঠোর, বড় ভীষণ; তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
অস্থিমাংসং প্রলয়ং চ যাতু।
অপ্রাপ্যবোধং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥"

অর্থাৎ—এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হইয়া যাউক, দেহের অস্থি, মাংস, চর্ম্ম প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যাউক, কিন্তু যত

দিন পর্য্যন্ত না বহু সাধনায় লব্ধ সেই আত্মজ্ঞান লাভ হইবে, ততদিন এই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিব না।

কি দৃঢ় সঙ্কল্প! সত্যলাভের জন্য কি আকুল আগ্রহ! এমনটি না হইলে সত্য বস্তু লাভ হয় কি? এমন দৃঢ় সঙ্কল্প সাধকের সাধনা বিফল হয় না। গৌতমের সাধনাও বিফল হইল না। গৌতমের আবাল্যের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিলেন। সকল দুঃখের অবসান হইল—নিরাবিল আনন্দে তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এই আত্মজ্ঞানলাভের জন্য তাঁহার নূতন নাম হইল বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী। গৌতম বুদ্ধ হইয়া জাতিনির্ব্বিশেষে ইতর, ভদ্র, সকলকেই উপদেশ দিতে লাগিলেন যে, হিংসা, দ্বেষ ও লোভ ছাড়িয়া মানুষ যদি কেবল সৎকার্য্য, সৎকথা ও সৎচিন্তা লইয়া থাকে, তবেই তাহার পুনর্জ্জন্ম রহিত হইয়া সকল দুঃখের নিবৃত্তি হয়; ঘটা করিয়া যাগযজ্ঞ করিলে বা পশুবধ করিলে সে দুঃখের অবসান হয় না। তাঁহার প্রচারিত নূতন ধর্ম্মের নাম হইল বৌদ্ধধর্ম্ম। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত তাঁহার এই প্রাণের ধর্ম্ম—প্রেমের ধর্ম্ম—বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। ধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে আশী বৎসর বয়সে তিনি নির্ব্বাণ লাভ করেন। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যগণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থের নাম ত্রিপিটক;—বিনয়, সূত্র ও

অভিধর্ম্ম—ইহার তিন ভাগ। বৌদ্ধধর্ম্ম যে শুধু ভারতেই প্রচারিত হইয়াছিল তাহা নহে, ভারত ছাড়াইয়া, তিব্বত, চীন, জাপান, শ্যাম, ব্রহ্ম, সিংহল, পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, আফ্‌গানিস্থান, তুর্কিস্থান, এসিয়া মাইনর, ইজিপ্ট প্রভৃতি আরও বহুস্থানে এই প্রেমের ধর্ম্ম ছড়াইয়া পড়িল।

এইরূপে প্রায় দেড় হাজার বৎসর যাবৎ পৃথিবীর বহু স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হইল। উত্থান ও পতন সমস্ত জিনিষেরই আছে। যাঁহার ইচ্ছায় ভারতে এই প্রেমের ধর্ম্মের উত্থান হইয়াছিল, আবার তাঁহারই ইচ্ছায় ভারতে ইহার পতনেরও সূত্রপাত দেখা দিল। বুদ্ধদেবের প্রেমের ধর্ম্ম সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিকৃত আকার ধারণ করিল—প্রাণহীন হইয়া মিথ্যাচরণে পর্য্যবসিত হইল। কিন্তু ইহার প্রতিবিধান হওয়া চাই। অবৈদিক বৌদ্ধদের পরাজিত করিয়া বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের যাগযজ্ঞ, পূজা প্রভৃতির প্রচলনের জন্যই চোলদেশে কুমারিল ভট্ট নামে এক অসাধারণ প্রতিভাশালী পণ্ডিতের উদ্ভব হইল। কুমারিল জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং বেদ, বেদান্ত ও ষড়দর্শনে তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে বেদের কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবহার প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। কুমারিল ভট্ট দেশের এই দুরবস্থা দেখিয়া ইহার প্রতিকারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বড় বড় বৌদ্ধ পণ্ডিতদের সহিত বিচারে

প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহাদের মতবাদ তিনি শাস্ত্রের যুক্তি ও তর্কে পরাজিত করিয়া বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিকট বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মস্তক নত হইতে লাগিল। দেশময় আবার ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সাড়া পড়িয়া গেল। কুমারিল কেবল বেদের কর্ম্ম-কাণ্ডেরই আলোচনা বেশী করিয়া করিতেন, কারণ বৌদ্ধদের কর্ম্মহীন নিরীশ্বরবাদ প্রতিরোধ করিবার জন্য তখন ইহারই খুব প্রয়োজন হইয়াছিল।

ব্যাসদেবের আদেশে জ্ঞানবাদী শঙ্কর কর্ম্মবাদী ভট্টপাদ কুমারিলের উদ্দেশ্যে প্রয়াগ অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। প্রয়াগ হিন্দুদিগের আর একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। এখানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী—এই তিনটি নদীর সঙ্গমস্থান এবং সেজন্য ইহার আর একটি নাম ত্রিবেণী। এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে প্রতিদিন শত শত নরনারী স্নান করিয়া মোক্ষ সঞ্চয় করিতেছে। শঙ্কর যথাসময়ে প্রয়াগে পৌঁছিলেন এবং প্রথমে ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান ও পূজাপাঠাদি শেষ করিয়া মনীষী ভট্টপাদের নিকট গমন করিলেন। তাঁহার নিকট যাইয়া দেখিলেন যে ভট্টপাদ তুষানলে দেহত্যাগ করিবার মানসে অগ্নিসংযুক্ত তুষস্তূপের উপর বসিয়া আছেন। উভয়ের মধ্যে পরিচয় হইলে কুমারিল শঙ্করের আগমনের কারণ জানিতে চাহিলেন। আচার্য্য শঙ্কর যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "পণ্ডিতপ্রবর! আমি ব্রহ্মসূত্রের অদ্বৈত

ভাষ্য রচনা করিয়াছি ; আপনি যদি এই অদ্বৈত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ভাষ্যের একখানা বার্ত্তিক (অর্থাৎ দোষগুণ দেখাইয়া যথার্থ সমালোচনা পূর্ব্বক ব্যাখ্যা) রচনা করেন, তাহা হইলে সর্ব্বত্র ইহা সাদরে গৃহীত হইতে পারে ; এই আশাতেই আমি আপনার নিকট আসিয়াছি।" ষোল বৎসরের ছেলে বেদান্তের ভাষ্য লিখিয়াছে এবং তাহার বার্ত্তিক রচনা করিতে হইবে কুমারিলের মত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে! কথা শুনিয়া কুমারিলের শিষ্যদের ইহা বালকের ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই মনে হইল না। পণ্ডিতপ্রবরের নিজের অভিমানেও আঘাত লাগিল। কিন্তু বালকের শান্ত মুখশ্রী দেখিয়া এবং তাহার গম্ভীর বচন শ্রবণ করিয়া কুমারিল নিজের মনের ভাব গোপন রাখিয়া ভাষ্যখানা দেখিতে চাহিলেন। শঙ্করের প্রধান শিষ্য পদ্মপাদ তখন ভাষ্যখানা তাঁহার হস্তে দিলেন। পণ্ডিত-প্রবর মন দিয়া ভাষ্যখানা দেখিতে লাগিলেন। উহা দেখিতে দেখিতে তাঁহার অভিমান দূর হইল এবং বালকের প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। তিনি কহিলেন, "আপনার ভাষ্যখানি দেখিয়া আমি খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছি। যতদূর দেখিলাম তাহাতে মনে হইতেছে ইহার সঙ্গে আমার মতের অমিল হওয়ার বিশেষ কোন কারণ নাই। তবে এতদিন এ সম্বন্ধে আমি কোন চিন্তা বা আলোচনা করি নাই। দেশের বর্ত্তমান প্রয়োজনানুসারে অবৈদিক সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণকে বিচারে

পরাজিত করিয়া ভারতে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মের পুনঃ প্রচার করিবার জন্যই আমি সারাজীবন চেষ্টা করিয়াছি। আপনার অনুরোধ রক্ষা করিবার ইচ্ছা আমার মনে জাগিতেছে বটে, কিন্তু এখন আর সময় নাই, তুষে আগুন দেওয়া হইয়াছে; উহা শীঘ্রই জ্বলিয়া উঠিয়া আমাকে গ্রাস করিবে। তবে আপনি এক কাজ করিতে পারেন। মণ্ডনমিশ্র নামক আমার এক গৃহী শিষ্য আছেন। তিনি আমার শিষ্য হইলেও কোন অংশে আমার অপেক্ষা হীন নহেন। আপনি যদি তাঁহাকে বিচারে পরাজিত করিয়া এই মত গ্রহণ করাইতে পারেন, তাহা হইলে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। আমার সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে—অন্তিমকাল উপস্থিত—নতুবা আমি নিজেই আপনার সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইতাম। আর একটি কথা মনে রাখিবেন,—মণ্ডনমিশ্রের সঙ্গে বিচারের সময় মধ্যস্থ মানিবেন তাঁহার স্ত্রী সরস্বতীদেবীকে। তিনি নামেই শুধু সরস্বতী নহেন, বাস্তবিক জ্ঞানেও তিনি সরস্বতী।" ভট্টপাদের কথা শুনিয়া শঙ্কর বিশেষ প্রীত হইলেন এবং ভগবানের নিকট তাঁহার আত্মার মঙ্গল কামনা করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইলেন।

পুণ্যতোয়া নর্ম্মদাতীরে মহিস্মতী নগর। মণ্ডনমিশ্রের রাজভবনসদৃশ সুন্দর ও সুশোভন অট্টালিকা সেই নগরে অবস্থিত। মণ্ডনমিশ্র গৃহী ও মহা ধনবান্ ব্যক্তি; আবার

বেদ, বেদাঙ্গ, ষড়্দর্শন প্রভৃতি বহুশাস্ত্রেও তিনি পারদর্শী। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচার-কৌশল দেখিয়া অনেক সময় গুরু কুমারিলভট্টও বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাইতেন। রাত নাই, দিন নাই, মণ্ডনগৃহে শাস্ত্রালোচনা, তর্ক, বিচার এবং তাহার মীমাংসা চলিয়াছে। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম—যাগ, যজ্ঞ, পূজা প্রভৃতি—যথানিয়মে প্রতিদিনই সে গৃহে সম্পন্ন হইতেছে। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের সেখানে এতটুকু ত্রুটি বা এতটুকু বিচ্যুতি নাই। মণ্ডনের স্ত্রী সরস্বতীদেবী রূপে ও গুণে তাঁহারই উপযুক্ত। সরস্বতীদেবীর আর এক নাম ছিল উভয়ভারতী; বড় বড় পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত উভয়ভারতীকে ভয় করিতেন এবং সহজে তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন না।

ভট্টপাদ কুমারিলের নিকট বিদায় লইয়া তাঁহারই কথামত আচার্য্য শঙ্কর মহিষ্মতী নগরাভিমুখে চলিলেন। এক মাস পথ চলিয়া শঙ্কর সে নগরে মণ্ডনমিশ্রের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীর সর্ব্বত্র অবারিত দ্বার; কিন্তু আচার্য্য মণ্ডনগৃহে প্রবেশ করিতে চাহিলে দ্বাররক্ষীরা পথ ছাড়িয়া দিল না, কহিল, "গৃহস্বামী মণ্ডনমিশ্র পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছেন। এ সময় সন্ন্যাসীর ভিতরে প্রবেশ করিবার নিষেধ আছে।" কয়েকজন বেদজ্ঞ সন্ন্যাসী তাঁহার সহিত দেখা করিতে চায়,—এই কথা শঙ্কর মণ্ডনকে বলিয়া পাঠাইলেন। মণ্ডন খবর পাঠাইলেন তিনি শ্রাদ্ধকার্য্য

শেষ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিবেন। আচার্য্য সে কথায় সন্তুষ্ট না হইয়া মণ্ডন যেখানে শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন, যোগবলে সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে এই ভাবে উপস্থিত হইতে দেখিয়া মণ্ডন যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইলেন; কারণ, শ্রাদ্ধকালে কর্ম্মহীন সন্ন্যাসীর মুখ দর্শন করিলে শ্রাদ্ধকার্য্য পণ্ড হয়; কাজেই তিনি শঙ্করকে যারপরনাই তিরস্কার ও অপমান করিতে লাগিলেন। আচার্য্য শঙ্কর কিন্তু তাহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া মণ্ডনের প্রতি প্রশ্নের উপহাসচ্ছলে এরূপ উত্তর দিতে লাগিলেন যে, তাহাতে মণ্ডন নিজেই তিরস্কৃত ও অপমানিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার ব্যাস ও জৈমিনিকল্প পুরোহিতদ্বয়ের অনুরোধে মণ্ডন ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শঙ্করের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং শান্তস্বরে তাঁহার তথায় আগমনের কারণ জানিতে চাহিলেন। তখন আচার্য্য কুমারিলভট্টের নিকট গমন, তাঁহার তুষানলে দেহত্যাগ, এবং তাঁহারই কথায় মণ্ডনের নিকট আগমন ইত্যাদি সকল কথা সবিস্তার বর্ণনা করিলেন। গুরুর তুষানলে প্রাণত্যাগের কথা শুনিয়া মণ্ডনের খুবই দুঃখ হইল। যাহাহউক, পরদিন তাঁহার সহিত বিচার আরম্ভ হইবে ঠিক করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া মণ্ডন শ্রাদ্ধকার্য্যে মনোযোগী হইলেন।

রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডনগৃহে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। সকলেরই মুখে এক কথা—দিগ্বিজয়ী

পণ্ডিত মণ্ডনের সঙ্গে এই বালক সন্ন্যাসী কি বিচার করিবে ? আবার কেহ কেহ বলিতে লাগিল, মণ্ডন যখন ইহার সঙ্গে বিচার করিবেন বলিয়া সম্মত হইয়াছেন, তখন ইনিও খুব বড় পণ্ডিত না হইয়া যান না। বিচারসভা লোকে লোকারণ্য। যথাসময়ে আচার্য্য শঙ্কর সশিষ্য তথায় উপস্থিত হইলেন। মণ্ডন যথোচিতভাবে সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের আসন প্রদান করিলেন। মধ্যস্থ কে হইবে কথা উঠিলে আচার্য্য মণ্ডন-পত্নী সরস্বতীদেবীকেই মধ্যস্থ মানিলেন। বিচারের পণ হইল বিজেতার ধর্ম্মগ্রহণ। বিচার আরম্ভ হইল। শঙ্কর কহিলেন, "বেদান্ত অদ্বৈতবাদ প্রচার করিতেছে। জীবই ব্রহ্ম, বুদ্ধি অজ্ঞানে আবৃত থাকে বলিয়া আমরা জীবকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক মনে করি ; আমাদের বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে এই পৃথক জ্ঞান থাকে না, তখন জীব ও ব্রহ্ম এক হইয়া যায়। একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই এ অবস্থা লাভ করা যাইতে পারে ; যাগ-যজ্ঞ-পূজাদিদ্বারা ঐ অবস্থা লাভ করা যায় না। যাগযজ্ঞাদি চিত্তকে দোষশূন্য এবং নির্ম্মল করে বটে, কিন্তু মুক্তি বা অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের লাভ ইহাতে হয় না।

মণ্ডনমিশ্র ঠিক ইহার বিরুদ্ধমতবাদী ; তিনি বলিলেন, কর্ম্ম করাই বেদের মূল উপদেশ। তাঁহার মতে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বেদে নাই। স্বর্গলাভই মুক্তি ; শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিলেই স্বর্গলাভ হয়। শঙ্কর বলিতেছেন জ্ঞানে মুক্তি, আর মণ্ডন বলিতেছেন কর্ম্মে মুক্তি। পাণ্ডিত্য বা শাস্ত্র-

জ্ঞানে কেহই কম নহেন। উভয়েই শাস্ত্র হইতে শত শত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। বেলা অনেক হইল, কিন্তু বিচার শেষ হইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সরস্বতীদেবীর সকল গৃহ কর্ম্মই পড়িয়া আছে, কাজেই তাঁহাকে বিচার-সভা হইতে উঠিতে হইল। উঠিয়া যাইবার সময় দু'জনের গলায় দু'টি মালা পরাইয়া দিয়া তিনি কহিলেন, "আপনারা বিচার করিতে থাকুন; যিনি পরাজিত হইবেন, তাঁহার গলার মালা আপনা হইতেই শুকাইয়া যাইবে।" সমস্ত দিন বিচার চলিল এবং সন্ধ্যার সময় ঠিক হইল পর দিন পুনরায় বিচার চলিবে।

দ্বিতীয় দিন আবার বিচার আরম্ভ হইল। দর্শকমণ্ডলী উভয়েরই যুক্তি, তর্কশক্তি ও শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। উভয়েরই গলার মালা তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি শুভ্র, কোনটাই ত মলিন হইতেছে না। একদিন নয়, দু'দিন নয়, এইরূপে আঠার দিন বিচার চলিল। অবশেষে আঠার দিনের দিন মণ্ডনের গলার মালা শুকাইতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া মণ্ডনপক্ষের সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর মুখও শুকাইতে লাগিল।

যাহাহউক, সরস্বতীদেবী আচার্য্য শঙ্করেরই জয় ঘোষণা করিলেন। আচার্য্যপক্ষ আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন এবং মণ্ডনপক্ষের পণ্ডিতগণ বিষণ্ণ বদনে একে একে সভাস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। তাঁহাদের সকলেরই মুখে

এক কথা—মণ্ডনের এই পরাজয়ে দেশ হইতে আবার বৈদিক ক্রিয়াকলাপ লুপ্ত হইবে।

পদ্মপাদ এইবার মণ্ডনকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে বলিলেন। মণ্ডন বিচারে পরাজিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু জৈমিনিকৃত মীমাংসাদর্শনের একটি সূত্রের অর্থ সম্বন্ধে এখনও তাঁহার সন্দেহ দূর হয় নাই। আচার্য্য যে অর্থ করিলেন, তাহা তাঁহার মনঃপূত হইল না। অবশেষে স্থির হইল, মন্ত্রবলে জৈমিনিকে তথায় আহ্বান করিয়া সূত্রের প্রকৃত অর্থ জানিয়া লইতে হইবে। মণ্ডন মন্ত্রসিদ্ধ ; মন্ত্রদ্বারা ব্যাসকল্প জৈমিনিকে তথায় আহ্বান করা হইল। সকল কথা শুনিয়া জৈমিনি আচার্য্য যে অর্থ করিয়াছেন তাহাই ঠিক বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। মণ্ডনের সকল সন্দেহ দূর হইল।

মণ্ডন সন্ন্যাস লইতে উদ্যোগী হইলেন ; কিন্তু সরস্বতী-দেবী তাঁহাকে বারণ করিয়া শঙ্করকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "আমার পতির পরাজয় এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই ; কাজেই আপনি তাঁহাকে এখনই সন্ন্যাস দিতে পারেন না। স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণী ও অর্দ্ধাঙ্গিনী ; যতক্ষণ না স্ত্রীরও পরাজয় হইতেছে, ততক্ষণ স্বামীর পরাজয় সম্পূর্ণ হহতে পারে না।" সে কথা শুনিয়া আচার্য্য প্রথমে একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং পরে কহিলেন, "মাতঃ, তাহাই হউক, আসুন, আপনিও বিচারে প্রবৃত্ত হউন। আপনার স্বামী যাহা প্রমাণ করিতে পারেন নাই, আপনি তাহা প্রমান করুন।"

উভয়ভারতী উত্তর করিলেন, "না আমার বিচারের বিষয় অন্য। আমি যাহা প্রশ্ন করিতেছি, আপনি তাহার উত্তর প্রদান করুন।" এই বলিয়া সরস্বতীদেবী তাঁহাকে কামশাস্ত্র-বিষয়ক এমন কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন যাহা গৃহস্থাশ্রমত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে আলোচনা করা নিষিদ্ধ। আচার্য্য তখন কহিলেন, "মাতঃ! আপনি অন্য প্রশ্ন করুন।" উভয়ভারতী অন্য প্রশ্ন না করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব প্রশ্নেরই উত্তর চাহিলেন। তখন আচার্য্য কহিলেন, "মাতঃ! আমি সন্ন্যাসী; সন্ন্যাসীর পক্ষে যাহার আলোচনা শাস্ত্র নিষেধ করিয়াছে, আমি তাহার আলোচনা করিতে চাই না। যদি আমি তাহা করি তাহা হইলে আদর্শচ্যুত হইব। আমার আদর্শ-চ্যুতিতে শিষ্যবর্গের মধ্যে এবং সন্ন্যাসীসমাজে নানা রূপ ব্যভিচার দেখা দিতে পারে। অতএব আমাকে এক মাস সময় দিন। ইতোমধ্যে আমি অন্য দেহে প্রবেশ করিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া আনিয়া দিব। আমি সন্ন্যাসীর দেহে ইহা না করিয়া, কোন গৃহীর মৃতদেহে প্রবেশ করিয়া এই কার্য্য সম্পন্ন করিব।" সরস্বতীদেবী স্বীকৃত হইলে আচার্য্য সশিষ্য নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। চলিতে চলিতে তাঁহারা এক রাজ্যে উপস্থিত হইলেন; সে দেশের রাজা শিকার করিতে আসিয়া সে সময় হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাজার নাম অমরুক; তাঁহাকে সৎকার করিবার জন্য শ্মশানে আনা হইয়াছে। আচার্য্য শিষ্যদের কহিলেন,

"দেখ, এই রাজার দেহে প্রবেশ করিয়াই আমি সরস্বতী দেবীর প্রশ্নের উত্তর লিখিব"—এই বলিয়া এক নির্জ্জন স্থানে দেহ-রক্ষা করিয়া তিনি যোগবলে রাজার মৃতদেহে প্রবেশ করিলেন। শিষ্যগণ যত্নের সহিত তাঁহার দেহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্মশানভূমিতে রাজার মৃতদেহে প্রাণ-সঞ্চারের লক্ষণ দেখা দিল। যাহারা রাজাকে সৎকার করিবার জন্য লইয়া আসিয়াছিল, তাহারা এই ব্যাপারে যারপর নাই বিস্ময়ান্বিত হইল। যাহাহউক, রাজাকে লইয়া তাহারা রাজধানী ফিরিয়া গেল। এইরূপে শঙ্কর রাজা সাজিয়া কামশাস্ত্র অনুশীলন করিতে লাগিলেন। এদিকে পুনর্জীবিত রাজার আচার ব্যবহার দেখিয়া রাজমহিষী এবং মন্ত্রীর মনে সন্দেহ হইতে লাগিল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, এই রাজার দেহে নিশ্চয়ই অন্য কোন যোগীপুরুষ বাস করিতেছেন। রাজবেশী শঙ্কর সরস্বতীদেবীর প্রশ্নের উত্তর লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; উত্তর লেখা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় এক নূতন বিপদ দেখা দিল। রাজ-মহিষী ও মন্ত্রীর আদেশে রাজ্যের যেখানে যত মৃতদেহ বিনা সৎকারে পড়িয়া আছে সেগুলির খোঁজ করিয়া সৎকার করান হইতে লাগিল। যাহাতে রাজার দেহবাসী আত্মা অন্য দেহ অবলম্বন করিয়া যাইতে না পারে, সেইজন্যই এই ব্যবস্থা। পদ্মপাদ ও অন্য শিষ্যগণ মহা চিন্তায় পড়িলেন,—কি জানি আচার্য্যের দেহও যদি সৎকার করিবার জন্য জোর করিয়া

লইয়া যায়। যাহাহউক, ইতোমধ্যে আচার্য্যের কার্য্যও শেষ হইল এবং তিনি রাজার দেহ ত্যাগ করিয়া স্বদেহে প্রবেশ করিলেন। শিষ্যদের চিন্তা দূর হইল; তাঁহারা বিশেষ আনন্দিত হইলেন।

আচার্য্য এইবার মহিষ্মতী নগরের দিকে চলিতে লাগিলেন এবং যথা সময়ে মণ্ডন-গৃহে উপস্থিত হইয়া সরস্বতী-দেবীকে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন। উত্তর দেখিয়া সরস্বতীদেবী স্বীকার করিলেন যে, এইবার তাঁহার স্বামীর পরাজয় সম্পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু তিনি স্বামীর সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বেই যোগাবলম্বনে নিজ দেহ ত্যাগ করিলেন। আচার্য্য শুভক্ষণে মণ্ডনমিশ্রকে সন্ন্যাস দিলেন, তাঁহার নূতন নাম হইল সুরেশ্বরাচার্য্য।

পাঁচ

শ্রীভগবানের ইচ্ছা ও আদেশেই শঙ্কর ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কাজেই, এ সম্বন্ধে সকল রকম বাধা-বিপত্তিই ক্রমে ক্রমে দূর হইতে লাগিল। মণ্ডনমিশ্রের সন্ন্যাসগ্রহণ তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের পক্ষে খুবই সহায়তা করিল। মণ্ডনমিশ্রকে সঙ্গে লইয়া আচার্য্য দক্ষিণদিক্-বিজয়মানসে বহির্গত হইলেন। চলিতে চলিতে মহারাষ্ট্র প্রদেশের নাসিক ও পাণ্ডারপুর হইয়া শ্রীশৈল নামক তীর্থে উপস্থিত হইলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে স্থানটি রমণীয়। এখানে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, পাশুপত, বীরাচারী ও কাপালিক প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসী বাস করিতেন; তন্মধ্যে কাপালিক সম্প্রদায়ই প্রবল। ইহারা কালীমাতার উপাসক; ইহাদের সাধনা বড় কঠোর। উগ্রভৈরব নামক এক দুষ্ট কাপালিক এই সম্প্রদায়ের নেতা। উগ্রভৈরব আচার্য্যের সঙ্গে বিচারে পরাজিত হইয়া যারপর নাই ক্ষুব্ধ হইলেন এবং কি করিয়া আচার্য্যের প্রাণনাশ করিতে পারেন তাহার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। একদিন আচার্য্য শঙ্কর বসিয়া আছেন, উগ্রভৈরব

ছল করিয়া তাঁহার চরণে মাথা রাখিয়া শিষ্য হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। আচার্য্যের নিকট সকলেই সমান,—তিনি তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। দুষ্টের অভিসন্ধি সহজে বোঝা যায় না। উগ্রভৈরব এরূপ যত্নের সহিত আচার্য্যের সেবা করিতে লাগিলেন যে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। উগ্রভৈরব যখন দেখিলেন সকলেরই বিশ্বাসের পাত্র হইয়াছেন, তখন একদিন সময় বুঝিয়া আচার্য্যের চরণে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আচার্য্য তাঁহার ক্রন্দনের কারণ জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। উগ্রভৈরব কহিলেন, "মহাত্মন্, আমার একটা বহুদিনের সাধ আপনি ইচ্ছা করিলেই পূর্ণ হয়,—অতএব আপনি যদি বলেন তাহা পূর্ণ করিবেন, তাহা হইলে সেটা কি বলিতে পারি।" আচার্য্য উগ্রভৈরবের ক্রন্দনে এবং ব্যাকুলতাদর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন বলিয়া কথা দিলেন। উগ্রভৈরব বুঝিলেন আচার্য্যের কথা মিথ্যা হইবে না; তখন নিশ্চিন্ত হইয়া কহিলেন, "মহাত্মন্, আমি এক সময় বহু তপস্যা করিয়া সশরীরে শিবলোকে যাইতে ইচ্ছা করি; আমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিব আমাকে দর্শন দিয়া কহিলেন যে, তুমি যদি কোন রাজা বা সর্ব্বজ্ঞের মাথা আহুতি দিয়া যজ্ঞ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। আমি রাজার মাথা কোথায় পাইব ? এতদিন আপনার সঙ্গে বাস করিয়া বুঝিয়াছি আপনি সর্ব্বজ্ঞ; অতএব আপনি যদি দয়া করেন,

তবে আমার বহুকালের বাসনা পূর্ণ হয়।" আচার্য্য প্রথমে উগ্রভৈরবকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন তিনি কিছুতেই বুঝিবেন না,—তখন তাঁহার কথাতেই স্বীকৃত হইলেন। ঠিক হইল, গভীর অমানিশায় নির্জ্জন বনমধ্যে এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে। অমাবস্যা তিথিতে উগ্রভৈরবের আনন্দ আর ধরে না। নির্জ্জন বনে এক গুহার মধ্যে উগ্রভৈরব সকল রকম আয়োজন করিতে লাগিলেন। নিশীথ রাত্রে সকলেই নিদ্রিত হইলে, আচার্য্য স্বেচ্ছায় মস্তক দান করিতে চলিলেন! তিনি সন্ন্যাসী, এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের প্রতি তাঁহার এতটুকু মমতা নাই; ইহা দ্বারা যদি অন্যের উপকার হয় তবে ক্ষতি কি? আচার্য্য গুহাদ্বারে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে লইয়া উগ্রভৈরব গুহাব ভিতরে প্রবেশ করিলেন। উগ্রভৈরব আর দেরী না করিয়া আচার্য্যকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। আচার্য্য কহিলেন, "একটু অপেক্ষা কর; আমি যখন সমাধিস্থ হইব, তখন তুমি আমার মস্তক ছেদন করিও।" এই বলিয়া আচার্য্য নিজেকে নিজের মধ্যে সমাহিত করিলেন। উগ্রভৈরব খড়্গহস্তে প্রস্তুত, সময় হইলেই আচার্য্যের মস্তক ছেদন করিবেন। এদিকে আচার্য্য চলিয়া আসিবার পরই পদ্মপাদ স্বপ্ন দেখিলেন যে, এক কাপালিক তাঁহার গুরুদেবের মস্তক ছেদন করিতেছে। এই ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া পদ্মপাদ মনে মনে তাঁহার ইষ্টদেবতা নৃসিংহদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। আচার্য্যের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ

করিবার বহু পূর্ব্বে পদ্মপাদ এক সময় বহু তপস্যা করিয়া নৃসিংহদেবের দর্শনলাভ করেন, এবং তাঁহার নিকট এই বর পাইয়াছিলেন যে, বিপদে পড়িয়া স্মরণ করিবামাত্র তিনি আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। স্মরণ করিবামাত্র নৃসিংহদেব পদ্মপাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে সেই গুহার দিকে ছুটিতে লাগিলেন। ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া পদ্মপাদের অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণও তাঁহার পিছনে পিছনে ছুটিতে লাগিলেন। পদ্মপাদ সেই গুহায় প্রবেশ করিলেন এবং উগ্রভৈরবের হস্ত হইতে খড়্গ কাড়িয়া লইয়া তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন। অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ সেই গভীর নিশীথে, নির্জ্জন বনে, গুহামধ্যে আচার্য্যকে সমাধিস্থ দেখিয়া এবং উগ্রভৈরবের মস্তক এইভাবে দ্বিখণ্ডিত হইতে দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এদিকে পদ্মপাদের ভীষণ গর্জ্জনে আচার্য্যের সমাধি ভঙ্গ হইল ; তিনি চাহিয়া দেখিলেন পদ্মপাদের দেহে নৃসিংহদেবের আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি তখন নৃসিংহদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া নৃসিংহদেব পদ্ম-পাদের দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে পদ্মপাদ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ; কিন্তু সকলের যত্ন ও শুশ্রূষায় অচিরে তাঁহার জ্ঞানসঞ্চার হইল। সমস্ত কথা শুনিয়া সকলেই পদ্মপাদকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। এই কথা যখন শ্রীশৈলতীর্থের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল, তখন কাপালিকগণ

ভয়ে ভীত হইল ; এবং কেহ কেহ বা তাঁহার এইরূপ স্বেচ্ছায় প্রাণ দিবার সঙ্কল্প শুনিয়া খুবই প্রশংসা করিতে লাগিল। শ্রীশৈল হইতে আচার্য্য গোকর্ণে আসিলেন। ইহাও একটি শৈবপ্রধান তীর্থস্থান ; এবং শৈব শ্রীকণ্ঠ সেখানকার খুব বড় পণ্ডিত। তিনি আচার্য্যের সহিত বিচার করিয়া তাঁহার মত শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তাহা গ্রহণ করিলেন। গোকর্ণ হইতে আচার্য্য মূকাম্বিকায় আগমন করিলেন এবং প্রথমেই এক ব্রাহ্মণ দম্পতির মৃত পুত্রের প্রাণদান করিলেন। সংবাদ যখন চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল, তখন দলে দলে লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল।

মূকাম্বিকা বহু পণ্ডিতের আবাসস্থল। পণ্ডিতমণ্ডলী এখানে একটী সরস্বতী-পীঠ নির্ম্মাণ করেন। নিয়ম ছিল, বিদেশ হইতে আগত যে সকল পণ্ডিত এখানকার পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজিত করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া সম্মানিত করা হইবে এবং উক্ত পীঠে উপবেশন করিতে দেওয়া হইবে। আচার্য্য শঙ্কর সেইস্থানে আসিয়া সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিচারে পরাজিত করিলেন এবং যখন পীঠে আরোহণ করিতে যাইতেছেন সেই সময় এক বৃদ্ধ পণ্ডিত তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিলেন, "আমার একটী প্রশ্ন রহিয়াছে, তাহার উত্তর দিয়া আপনি পীঠে আরোহণ করুন।" আচার্য্য হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "বলুন আপনার প্রশ্ন কি ?" বৃদ্ধ পণ্ডিত কহিলেন, "এই ঘরের কোন কোণে একটী লৌহ শলাকা প্রোথিত রহিয়াছে। বিচারে

জয় লাভ করিয়া আপনি সর্ব্বজ্ঞের ন্যায় সম্মান প্রাপ্ত হইয়া পীঠে আরোহণ করিতে যাইতেছেন, অতএব আপনি যে বাস্তবিকই সর্ব্বজ্ঞ তাহা আমি আর একটি পরীক্ষা দ্বারা জানিতে চাই। এই লৌহ বলয়টি লউন, এবং উহা এরূপভাবে নিক্ষেপ করুন যাহাতে বলয়টি গৃহের কোণে প্রোথিত সেই লৌহ শলাকাটীর উপর যাইয়া পড়ে।" আচার্য্য বলয়টি গ্রহণ করিয়া একটু ধ্যানস্থ হইলেন এবং তাহার পর সেটিকে এরূপ ভাবে নিক্ষেপ করিলেন যে, উহা যথাস্থানে পতিত হইল; তখন চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল; এবং আচার্য্য সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে পীঠে আরোহণ করিলেন।

মূকাম্বিকা ত্যাগ করিয়া আচার্য্য শ্রীবেলিতে উপস্থিত হইলেন। এখানে পার্ব্বতীদেবী ও মহাদেবের মন্দির স্থাপিত আছে; আচার্য্য সশিষ্য পর্ব্বতী ও মহাদেব দর্শন করিয়া এক নির্জ্জন স্থানে আসন স্থাপন করিলেন। কিন্তু তিনি যতই নির্জ্জন স্থানে আসন স্থাপন করুন না কেন, তাঁহার খ্যাতি তাঁহাকে নির্জ্জনে থাকিতে দেয় না। এই স্থানও পণ্ডিতপ্রধান; কাজেই দলে দলে পণ্ডিতগণ আসিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীবেলিতে এক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার নাম প্রভাকর। ধন, দৌলত, পাণ্ডিত্য—এ সকলের অভাব তাঁহার ছিল না, কিন্তু তিনি পুত্রসুখে বঞ্চিত ছিলেন; সেই হেতু প্রভাকর ও তাঁহার পত্নী সর্ব্বদাই দুঃখে কালযাপন করিতেন।

তাঁহাদের এক পুত্র ছিল, কিন্তু সে না থাকারই মত। বালকের বয়স তের বৎসর হইয়াছে, কিন্তু এখনও সে কথা বলিতে পারে না ; শুধু যে বালক কথা বলে না তাহা নহে, সর্ব্ব সময়ে জড়ের মত থাকিত—এমন পুত্র লইয়া কে সুখী হইতে পারে ? আচার্য্যের অদ্ভুত শক্তির কথা শুনিয়া প্রভাকর পুত্রকে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে আচার্য্যের পদতলে রাখিয়া দিয়া তাঁহার নিকট সকল কথা নিবেদন করিলেন। আচার্য্য বালককে তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন—

"কস্ত্বং শিশো কস্য কুতোঽপি গন্তা
কিং নাম তে ত্বং কুত আগতোঽসি।
এতদ্‌বদ ত্বং মম সুপ্রসিদ্ধং
মৎপ্রীতয়ে প্রীতিবিবর্দ্ধনোঽসি ॥"

"ওহে বালক! তুমি কে ও কাহার পুত্র? কোথায় যাইতেছ? তোমার নাম কি? কোথা হইতে আসিতেছ ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া আমাকে সন্তুষ্ট কর। তোমাকে দেখিয়া আমার অতিশয় আনন্দ হইতেছে।" আচার্য্যের এই প্রশ্ন শুনিয়া বালক উত্তর দিল—

"নাহং মনুষ্যো ন চ দেবযক্ষৌ
ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ।
ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো
ভিক্ষুর্নচাহং নিজবোধরূপঃ ॥"

"আমি মনুষ্য, দেবতা কিংবা যক্ষ নহি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিংবা শূদ্র নহি। ব্রহ্মচারী, গৃহী, বাণপ্রস্থাবলম্বী কিংবা ভিক্ষুকও নহি। আমি নিজবোধরূপ (আত্মা)।" এইরূপ ভাবের ত্রয়োদশটী শ্লোক বলিয়া বালক আচার্য্যের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিল। একি! যে সামান্য একটি কথাও বলিতে পারে না, তাহার মুখে শাস্ত্রজ্ঞানের সারস্বরূপ এই শ্লোকগুলি শুনিয়া সকলেই যারপর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। আচার্য্য তখন শিষ্যদের কহিলেন, "বৎসগণ! এই স্তোত্রের নাম 'হস্তামলক স্তোত্র।' ইহা যিনি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন, তাঁহার পক্ষে সমস্ত ব্রহ্মজ্ঞান হস্তে আমলকী ফলেব ন্যায় প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হইবে।" তারপর প্রভাকরকে কহিলেন, "পণ্ডিতপ্রবর, এই বালক পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী; উহাকে লইয়া আপনাদেব কোনও সুখ হইবে না। উহাকে আমাব সঙ্গে থাকিতে দিন।" আচার্য্যের কথা শুনিয়া প্রভাকরের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এতদিন পরে পুত্রের মুখে কথা ফুটিয়াছে, কোথায় ইহাকে লইয়া সংসারসুখ উপভোগ করিবেন, আর আচার্য্য কিনা ইহাকে তাঁহার নিকট রাখিয়া যাইতে বলিতেছেন। প্রভাকর এই কথায় সম্মত হইতে পারিলেন না; অবশেষে পুত্র লইয়া গৃহে ফিরিলেন। কিন্তু গৃহে আসিয়া পুত্র আর কথা বলে না। মাতা কোলে লইয়া বালককে কথা

বলাইবার জন্য কত চেষ্টা করিলেন, একটিবার মা বলিয়া ডাকিবার জন্য কত অনুরোধ করিলেন, কিন্তু বালকের মুখে কথা নাই, পূর্ব্ববৎ বাক্যহীন।

পরদিন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পুত্রকে লইয়া আবার আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি কহিলেন, "দেখুন, এই বালককে লইয়া আপনাদের কোনও সুখ হইবে না। প্রকৃতপক্ষে এই বালক আপনাদের পুত্রও নহে।" শেষ কথা শুনিয়া প্রভাকর ও তাঁহার পত্নী উভয়েই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আচার্য্যের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। আচার্য্য বলিতে লাগিলেন, "দেখুন এই বালকের জীবনের সহিত একটি অদ্ভুত ঘটনা জড়িত রহিয়াছে; তাহা জানেন না বলিয়াই আপনারা ইহাকে আপনার পুত্র বলিয়া মনে করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বালকটি আপনাদের পুত্র নহে। ঘটনাটি কি বলিতেছি শুনুন। বহুদিন পূর্ব্বে আপনারা যখন একবার তীর্থদর্শনে যান, তখন আপনার পুত্রের বয়স দুই বৎসর মাত্র। নানা তীর্থ দর্শন করিয়া অবশেষে আপনারা যমুনা তীরে একটী বাড়ী লইয়া কিছু দিন বাস করেন। আপনাদের বাসস্থানের নিকটেই একজন সাধুর কুটীর ছিল। একদিন বালকের মাতা যমুনায় স্নান করিতে যাইবার সময়, পাছে বালক একা কোথাও চলিয়া যায় সেই জন্য উক্ত সাধুকে একটু দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া যান। সাধুটি তখন ধ্যানস্থ ছিলেন, বালকের মাতার কথা কিছুই তিনি শুনিতে

পান নাই ; কিন্তু বালকের মাতা তখন তাহা বুঝিতে পারেন নাই। বালকের মাতা স্নানান্তে গৃহে ফিরিয়া দেখেন পুত্রটি নাই। কি হইল ?—কোথায় গেল ? অনেক অনুসন্ধানের পর নদীতে বালকের মৃতদেহ পাওয়া গেল। বালকের মাতা মৃত পুত্রটিকে সাধুর সম্মুখে রাখিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সাধুটি তাঁহার এই ক্রন্দনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া ভাবিলেন যে, তাঁহার দোষেই ইহার পুত্রটি গেল এবং সেইজন্য বালকের মাতাকে সান্ত্বনা দিয়া তিনি ধ্যানস্থ হইলেন। সাধু সিদ্ধযোগী ছিলেন ; তিনি নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া বালকের মৃতদেহে প্রবেশ করিলেন। অল্পকালমধ্যে মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারের লক্ষণ দেখা গেল ; বালক বাঁচিয়া উঠিল। আপনারা আসল কথা জানিতে পারিলেন না ; মনে করিলেন সাধুর কৃপায় পুত্রটি বাঁচিয়া উঠিয়াছে। কিছুকাল পরে আপনারা স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। আশা করি এইবার ঘটনাটি আপনাদের মনে পড়িতেছে। তাই বলিতেছিলাম, এই বালক আপনাদের পুত্র নহে। ইনি একজন সিদ্ধপুরুষ, পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানী, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে এই দেহধারণ করিয়াছেন, কিন্তু সাধারণ মানবের ন্যায় ইনি সংসারসুখে মাতিয়া থাকিতে পারিবেন না। অতএব ইঁহাকে আমার সহিত থাকিতে দিন।” সকল কথা শুনিয়া বালকের মাতাপিতা যারপর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং অতীতের সকল কথাই তাঁহাদের মনে পড়িল। কিন্তু তাহা হইলে কি হয় ; পুত্রস্নেহ এমনি গভীর যে, তাঁহারা

ইহাকে ভুলিতে পারিতেছেন না। কাজেই সকল কথা শুনিয়াও পুত্রটিকে আচার্য্যের নিকট রাখিয়া যাইতে তাঁহাদের মন সরিতেছে না। আচার্য্য তাঁহাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "আপনারা বালককেই না হয় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, সে আপনাদের সঙ্গে যাইতে চায়, কি এইখানেই থাকিতে চায়?" মাতাপিতা বালককে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বালক উত্তর দিল, "আপনারা ত আমার সম্বন্ধে সকল কথাই শুনিলেন। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আচার্য্যের সঙ্গেই থাকিতে দিন; তাঁহার সঙ্গে থাকিতেই আমার একান্ত ইচ্ছা।" বালকের কথা শুনিয়া মাতাপিতার খুবই কষ্ট হইল, কিন্তু কষ্ট হইলেই বা কি করিবেন! কাজেই বালককে আচার্য্যের নিকট রাখিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে তাঁহারা গৃহে ফিরিলেন। আচার্য্য যথাসময়ে বালককে সন্ন্যাস দিলেন; তাহার নাম হইল হস্তামলক।

শ্রীবেলি ত্যাগ করিয়া আচার্য্য সশিষ্য শৃঙ্গগিরী নামক স্থানে আসিলেন। এই মনোরম স্থানটি তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে অবস্থিত। এই সেই স্থান, যেখানে বহু বৎসর পূর্ব্বে সদ্‌গুরু-অন্বেষণকালে আচার্য্য সর্প ও ভেকের মিত্রতা দেখিয়াছিলেন। এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সকলের হৃদয় আকৃষ্ট করিল। শিষ্যদের ইচ্ছা হইল এখানে একটি মঠস্থাপন করিয়া সাধন-ভজন করেন। আচার্য্যের নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই নাই —শিষ্যদের ইচ্ছাই তাঁহার ইচ্ছা। সনাতন বৈদিকধর্ম্ম-

প্রচারের মানসে তিনি এইস্থানে একটি মঠ নির্ম্মাণ করিলেন, এবং যথাবিধি শারদাদেবীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিছুদিন তথায় অবস্থান করিয়া নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী বহু স্থানের পণ্ডিত ও বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতাদের সহিত তিনি ধর্ম্মের বিচার ও আলোচনা করিতে লাগিলেন। ফলে, অনেকেই আপনাদের ধর্ম্মমতের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া শঙ্কর-প্রচারিত ধর্ম্মমত গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

এই স্থানে অবস্থানকালে আচার্য্য শঙ্কর অধিক সময়েই বাহ্যজগত ভুলিয়া, আপনাতে আপনি ডুবিয়া, ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেন। এই অবস্থা সাধনার শেষ অবস্থা—সাধক এই অবস্থায় উপনীত হইলে নিরন্তর আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকেন। যখন তাঁহার মন বাহ্যজগতে ফিরিয়া আসিত, তখন শিষ্যদের উপলক্ষ্য করিয়া সর্ব্বসাধারণ যাহাতে শাস্ত্রের সারমর্ম্ম বুঝিতে পারে তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে স্তোত্র রচনা করিয়া মুখে মুখে বলিয়া যাইতেন, আর শিষ্যগণ তাহা লিখিয়া লইতেন। এইরূপে বিবেকচূড়ামণি, অপরোক্ষানুভূতি, দৃকদর্শন-বিবেক, অঞ্জনবোধিনী, বোধসার, আত্মবোধ, বেদান্তকেশরী, ললিতাত্রিশতীভাষ্য, প্রপঞ্চসার, আত্মানাত্মাবিবেক, মোহ-মুদ্গর, সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ, মনীষাপঞ্চক, নির্ব্বাণ-ষটক, মনিরত্নমালা এবং আরও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিত হইল।

এই সময় গিরি নামক শান্ত ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ এক ব্রাহ্মণ যুবক

আচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। গিরি লেখাপড়া একেবারেই জানিতেন না। আচার্য্যের নিকট সর্ব্বদাই বেদ ও বেদান্তের আলোচনা চলিয়াছে—গিরি এ সকলের কিছুই বুঝিতেন না। শাস্ত্রালোচনার কার্য্য তাঁহার নাই, গিরি সেইজন্য গুরুসেবাতেই অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন; গুরুর এতটুকু কার্য্যও তিনি অন্যকে করিতে দিতেন না। অন্যান্য শিষ্যগণও ভাবিলেন গিরি যখন পঠন-পাঠন সম্বন্ধে কিছুই করিতে পারেন না, তখন তাঁহার পক্ষে এইরূপ কার্য্যই ঠিক। গিরি অপেক্ষা যে তাঁহারা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, এ চিন্তাও তাঁহাদের মনে আসিয়া থাকিবে।

শিষ্যগণ প্রতিদিনই আচার্য্যের নিকট বেদান্তাদি শাস্ত্রগ্রন্থ-সকল পাঠ করেন। গিরি এ সকলের কিছুই বোঝেন না বটে, কিন্তু তথাচ জোড়হস্তে সর্ব্বদাই সেখানে উপস্থিত থাকেন; আচার্য্যের কখন কি প্রয়োজন হয়, সেইজন্যই দাঁড়াইয়া থাকেন। একদিন আচার্য্য পড়াইতে বসিয়া দেখেন প্রতি-দিনকার মত গিরি সেখানে উপস্থিত নাই। আচার্য্য তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আচার্য্যকে এইভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া একজন তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে তিনি কহিলেন, "কই গিরিকে তো দেখিতেছি না; সে আসুক তার পর আরম্ভ করিব।" পদ্মপাদ ইহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন, "ভগবন্! গিরি ত নিরক্ষর, শাস্ত্রালোচনা সে তো কিছুই বোঝেনা এবং বুঝিবেও

না, কাজেই তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া লাভ কি ?" আচার্য্য একটু হাসিলেন। গিরির অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল; গিরির গুরুসেবার ফল সদ্য সদ্য ফলিতে চলিল। একমাত্র গুরুসেবা ও গুরুভক্তির দ্বারা যে শিষ্যের সকল রকম মূর্খতা দূর হইতে পারে আচার্য্য তাহাই দেখাইতে মনস্থ করিলেন; আর ইহাতে বিদ্যাভিমানী শিষ্যদেরও শিক্ষালাভ হইবে। তিনি মনে মনে গিরিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, সে যেন সর্ব্ববিদ্যা লাভ করে। শক্তিমান্ গুরুর ইচ্ছামাত্র শিষ্যের মূর্খতা নিমেষে দূর হইল। গিরির মুখ হইতে আপনা হইতেই সংস্কৃত শ্লোক বাহির হইতে লাগিল। শ্লোকগুলি গুরুস্তোত্র, তোটকছন্দে রচিত; গিরি স্তোত্রটি বলিতে বলিতে আসিতেছে দেখিয়া সকলেই যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। সকলেই বুঝিলেন ইহা গুরুর অশেষ কৃপা ছাড়া আর কিছুই নহে। গিরি আসিয়া আচার্য্যচরণে প্রণাম করিলেন। আচার্য্য তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "গিরি! তোমার গুরুসেবা এবং গুরুভক্তি আদর্শস্থানীয় এবং সেইজন্য আজ দেবী ভগবতীর কৃপায় তুমি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইলে।" যথাসময়ে আচার্য্য তাহাকে সন্ন্যাস দিলেন, এবং তাহার নাম হইল "তোটাকাচার্য্য।" গিরির জীবন জগতের ইতিহাসে শিষ্যত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!

ছয়

শিষ্যের কৃতিত্বেই গুরুর আনন্দ। আচার্য্য শঙ্কর একদিন সুরেশ্বরাচার্য্যকে ডাকিয়া কহিলেন, "আপনি আমার বেদান্ত-ভাষ্যের একখানা বার্ত্তিক রচনা করুন।" সুরেশ্বরাচার্য্য যার-পর নাই বিস্ময়ান্বিত হইয়া কহিলেন, "ভগবন্! আপনার ভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা আমি কি করিব ?" আচার্য্য কহিলেন, "হাঁ, আপনিই লিখিবেন—এবিষয়ে আপনিই উপযুক্ত।" আচার্য্যের একান্ত ইচ্ছা জানিয়া সুরেশ্বরাচার্য্য বার্ত্তিক রচনা করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি বার্ত্তিক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন; ক্রমে একথা মঠের সকলেরই কর্ণগোচর হইল। পদ্মপাদের ইহা ভাল লাগিল না; আচার্য্যের ভাষ্যের উপর আবার বার্ত্তিক রচনা! শিষ্য হইয়া গুরুর ভাষ্যের দোষগুণ-বিচার, এ সকল কথা পদ্মপাদ তাঁহার শিষ্যদের সঙ্গে আলোচনা করিলেন। তদ্ব্যতীত আরও এক কথা—সুরেশ্বরাচার্য্য সারা-জীবন বেদের কর্ম্মকাণ্ডের কার্য্যই প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়া-ছেন; এ বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না, একমাত্র আচার্য্যের নিকট পরাজিত হইয়াই তিনি সন্ন্যাস লইতে বাধ্য

হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জীবনভোর আলোচনার সংস্কার তিনি কাটায়া উঠিতে পারিবেন কি? এ সব কথা যখন আচার্য্যের কাণে উঠিল তখন তিনি একটু হাসিয়া কহিলেন, "সুরেশ্বরাচার্য্য! সকলেই সন্দেহ করিতেছে বার্ত্তিক রচনা করিতে যাইয়া কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি আজন্মসংস্কারবশতঃ আপনি ঠিকভাবে ভাষ্যের বিচার করিতে পারিবেন না। অতএব আমি বলি আপনি বার্ত্তিক রচনা করিবার পূর্ব্বে কর্ম্মবাদ নিরসন করিয়া জ্ঞানই যে মুক্তির সোপান তাহা প্রমাণ করিয়া একখানি গ্রন্থ লিখুন, তাহা হইলে সকলেরই সন্দেহ দূর হইবে।" তদনুসারে সুরেশ্বরাচার্য্য "নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি" নামক গ্রন্থ লিখিয়া সকলকে দেখাইলেন। সেই গ্রন্থ পড়িয়া সকলেই প্রশংসা করিলেন। ঐ গ্রন্থে সুরেশ্বরাচার্য্য কর্ম্মবাদ এমনি সুন্দরভাবে নিরসন করিয়াছেন যে, তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কিন্তু তবুও পদ্মপাদ এবং তাঁহার শিষ্যগণের ইচ্ছা নয় যে, সুরেশ্বরাচার্য্য আচার্য্যের ভাষ্যের উপর বার্ত্তিক রচনা করেন। আচার্য্য তখন সুরেশ্বরাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "দেখিতেছি, আপনি আমার সূত্রভাষ্যের উপর বার্ত্তিক রচনা করেন, ইহা ভগবানের ইচ্ছা নহে; যাহাহউক, আপনি আমার বৃহদারণ্যক ভাষ্য এবং তৈত্তেরীয় ভাষ্যের উপর বার্ত্তিক রচনা করুন এবং "ব্রহ্মসিদ্ধি" ও "ইষ্টসিদ্ধি" নামক আরও দুইখানি গ্রন্থ লিখুন। আপনি দুঃখিত হইবেন না, এ গ্রন্থগুলিই আপনাকে চির-

স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। কর্ম্মবশতঃ আপনাকে আর একবার জগতে আসিতে হইবে। সেই জন্মে আপনি আমার ভাষ্যের উপর এমন একখানি টীকা লিখিবেন, যাহা পণ্ডিতগণ বার্ত্তিকেরই মত আদর করিবেন এবং সেই টীকা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে।" সুরেশ্বরাচার্য্য বেশ একটু দুঃখিত হইয়াই কহিলেন, "ভগবন্, আপনার কথাতেই আমি বার্ত্তিক রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, আবার আপনার আদেশেই আমি এ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু আমি যথার্থ বিচার করিতে সক্ষম হইব না, সকলের এই সন্দেহই আমার মনে কষ্ট দিতেছে। যাহাহউক, আমি অভিসম্পাত করিতেছি যিনি যত বড় পণ্ডিতই হউন না কেন এবং আপনার সূত্রভাষ্যের টীকা রচনা করুন না কেন, তাঁহার টীকা কখনও আদৃত হইবে না।"

শৃঙ্গগিরি-বাসকালে একদিন আচার্য্য শিষ্যদিগকে পড়াইতেছেন, এমন সময় তাঁহার মুখে মাতৃস্তন্যদুগ্ধের স্বাদ অনুভব হইল। পূর্ব্বকথা তাঁহার মনে পড়িল। মৃত্যু-শয্যায় মাতা তাহাকে স্মরণ করিলে তিনি যেখানেই থাকুন না কেন বুঝিতে পারিবেন এবং তৎক্ষণাৎ মাতৃসমীপে উপস্থিত হইবেন; তিনি আর দেরী করিলেন না। শিষ্যদের নিকট সকল কথা বলিয়া আকাশপথে মাতৃসমীপে যাত্রা করিলেন এবং শিষ্যদেরও পদব্রজে তাঁহার গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে বলিয়া গেলেন।

আচার্য্য শঙ্কর অতিসত্বর কালাডি গ্রামে উপস্থিত হইলেন।

জননীসমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। সন্ন্যাসী শঙ্কর—দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শঙ্কর—মাতার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন এবং তৎপরে মাতৃসেবায় নিযুক্ত হইলেন। বহুকালপরে পুত্রমুখ দর্শন করিয়া বিশিষ্টা-দেবীর মৃতদেহে যেন প্রাণ আসিল। তাঁহার চক্ষে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। জননী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা শঙ্কর! যেজন্য আট বৎসর বয়সে সমস্ত ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইয়া-ছিলে, তোমার সে বাসনা পূর্ণ হইয়াছে ত?" শঙ্কর মুখ ফুটিয়া সে কথা বলিতে পারিলেন না; কিন্তু জননী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই সকল কথা বুঝিতে পারিলেন। উভয়ের মধ্যে নানা কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল—সে কথাবার্ত্তার কি আর শেষ আছে? কথায় কথায় শঙ্কর জানিতে পারিলেন যে, যে আত্মীয়ের উপরে তাঁহার মাতার ভরণপোষণের ভার দিয়া গিয়াছিলেন, তিনি কিছুই করেন নাই। মাতা কহিলেন, "আমার শয্যাপার্শ্বে যে দরিদ্রা বিধবাটি বসিয়া রহিয়াছে, তাহারই সেবা ও যত্নে তিনি এখনও পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছেন। সমস্ত সম্পত্তি সেই আত্মীয়দের নিকট হইতে লইয়া যেন এই বিধবাটিকে দেওয়া হয়, ইহাই আমার শেষ আদেশ।" শঙ্করও মায়ের কথামত ব্যবস্থাই করিবেন বলিলেন। এইরূপ অনেক কথাবার্ত্তার পর মায়ের আদেশে শঙ্কর স্নান করিতে গেলেন। সেই নদী, সেই ঘাট,—অতীতের কত স্মৃতি বহন করিয়া ইহারা আজও বিরাজিত। একদিন এখানেই স্নান

করিবার সময় কুম্ভীরের মুখে প্রাণ দিতে যাইয়া মায়ের নিকট হইতে সন্ন্যাসের অনুমতি পাইয়াছিলেন। নিকটেই তাঁহাদের কুলদেবতা শ্রীকৃষ্ণের মন্দির। আচার্য্য বিদায়কালে গ্রামবাসীকে শ্রীকৃষ্ণের নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন, দেখিলেন তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষিত হইয়াছে। শঙ্কর যথাবিধি স্নান এবং দেবতাদি দর্শন করিয়া গৃহে ফিরিলেন এবং জননীর চরণসমীপে বসিলেন। তখন বিশিষ্টাদেবী তাঁহাকে কহিলেন "বাবা শঙ্কর! তোমার বাসনা যখন ভগবান পূর্ণ করিয়াছেন—এইবার তুমি আমার বাসনা পূর্ণ কর। অন্তিমসময়ে শ্রীভগবানের দর্শন করাইয়া আমার মানবজন্ম সার্থক করাও।" গৃহে যখন আর কেহই রহিল না, তখন আচার্য্য জননীর নিকট বসিয়া তাঁহাকে মন স্থির করিয়া সম্মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে বলিলেন। শঙ্কর আসনে বসিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন,—ক্রমে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইল। কিছুকাল পরে তাঁহার মুখ হইতে একটি স্তোত্র বাহির হইল—স্তোত্রটি শিবস্তোত্র—স্তোত্রটি বড়ই মধুর, বড়ই প্রাণস্পর্শী; তাহার পর ধীরে ধীরে উভয়েরই বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইল; উভয়েই আনন্দময় জ্যোতিঃসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে উভয়ের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। জননী পুনরায় কহিলেন, "বাবা! আমার ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি দর্শন করিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে, তাহা আমাকে দর্শন করাও।" "তাহাই হইবে" বলিয়া শঙ্কর আবার ধ্যানস্থ হইলেন। কিয়ৎকাল

অতীত হইলে তাঁহার মুখ হইতে একটি স্তোত্র নির্গত হইল—সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক জ্যোতিঃসাগরে ভাসিয়া গেল। সে জ্যোতিঃ চন্দ্রকিরণসদৃশ স্নিগ্ধ অথচ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল। সেই জ্যোতিঃর মধ্যস্থলে শঙ্খচক্র-গদা-পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তি এবং লক্ষ্মীদেবী তাঁহার পদ-সেবা করিতেছেন—সে রূপ, সে সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। বিশিষ্টাদেবী জগৎ ভুলিয়া, নিজেকে ভুলিয়া সেই পদ্মপলাশলোচন চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন এবং সেই আনন্দময় জ্যোতিঃসাগরে ডুবিয়া গেলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া তাহাতে মিশিয়া গেল। বিশিষ্টাদেবীর মানবজনম সার্থক হইল। শঙ্করের ন্যায় পুত্র গর্ভে ধারণ করিয়া মাতা বিশিষ্টাদেবী যোগিজনবাঞ্ছিত স্থান লাভ করিলেন। জগত-ইতিহাসে বিশিষ্টাদেবীর মত মাতা এবং শঙ্করের মত পুত্র খুবই বিরল।

শঙ্কর মাতার মৃতদেহের সৎকারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। যাঁহার হস্তে শঙ্কর সমস্ত সম্পত্তি অর্পণ করিয়া মায়ের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, বহুদিন পরে তিনি শঙ্করগৃহে উপস্থিত হইলেন এবং বিশিষ্টাদেবীর সৎকারের ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শঙ্করের ইহাতে কোন আপত্তি নাই, তবে মায়ের মুখাগ্নি তিনি নিজেই করিবেন বলিলেন। ধনী আত্মীয়টি ভাবনায় পড়িলেন। বিশিষ্টাদেবী মৃত্যুকালে সম্পত্তির যেরূপ ব্যবস্থা করিতে

বলিয়া গিয়াছেন, তাহাও তিনি শুনিয়াছেন। সম্প্রতি হস্ত-চ্যুত হয় দেখিয়া শঙ্কর যাহাতে মাতার মুখাগ্নি না করেন সে চেষ্টা তিনি করিতে লাগিলেন। কিন্তু শঙ্কর মায়ের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কাজেই একাজ তাঁহাকে করিতেই হইবে। আত্মীয়টি উপায়ন্তর না দেখিয়া প্রকাশ্যভাবেই শঙ্করের সহিত বিবাদ করিতে লাগিলেন এবং বিশিষ্টাদেবীর চরিত্র সম্বন্ধে নানারূপ কুৎসা প্রকাশ করিতে করিতে ক্রোধভরে সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। অনেকেই তাঁহাকে ভয় করিত, কাজেই শঙ্কর মাতার সৎকার করিবার জন্য কাহারও সাহায্য পাইলেন না। শঙ্কর অনন্যোপায় হইয়া একাই মাতৃশব বহন করিয়া গৃহসংলগ্ন উত্থানেই তাঁহার সৎকার করিলেন। সতী স্বাধ্বী, পূতচরিত্রা মাতার অপমানে শঙ্কর জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে অভিসম্পাত করিলেন, "তোমাদের গৃহে কোন সন্ন্যাসী কখনও ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিবে না। ব্রাহ্মণ হইয়াও তোমরা বেদবিহীন হইবে এবং আমার মত সকলকেই গৃহসংলগ্ন উত্থানে মৃতের সৎকার করিতে হইবে।" রাজা রাজশেখর যখন শুনিলেন আচার্য্যের উপর তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ অত্যাচার করিতেছে, তখন পাত্রমিত্রসহ রাজা নিজে সেখানে উপস্থিত হইলেন। সকল সংবাদ অবগত হইয়া যখন তিনি দুষ্টের দমনের জন্য শাস্তি দিতে চাহিলেন, তখন সকলেই কাতরভাবে আচার্য্যের নিকট ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। আচার্য্যের কাহারও সহিত শত্রুতা নাই, থাকিতেও পারে না;

তিনি সকলকেই ক্ষমা করিলেন। বিশিষ্টাদেবীর শেষ ইচ্ছানুসারে সম্পত্তিরও ব্যবস্থা হইল। ব্রাহ্মণদের বেদ-বিহীন হওয়াটা খুবই কঠোর শাস্তি, কাজেই জ্ঞাতিদের কাতরতায় তিনি এই অভিশাপটি তুলিয়া লইলেন। অপর দুইটি অভিসম্পাত তাহারা নিজেরাই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পালন করিতে রাজী হইল। রাজা রাজশেখর যখন দেখিলেন সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া গিয়াছে, তখন তিনি লোকজন সহ স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

সাত

ইতোমধ্যে আচার্য্যের অন্যান্য শিষ্যগণও আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

তখন তিনি কেরলদেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন। রাজা সুধন্বাও আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। সকলেরই ইচ্ছা আচার্য্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া তীর্থস্থানগুলির সংস্কার করেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন যে, বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ এবং ধর্ম্মহীন পাণ্ডিত্যই তীর্থস্থানগুলিতে বিরাজ করিতেছে, আর সেইজন্যই ধর্ম্মবেশধারী অধার্ম্মিকদের এত অত্যাচার চলিতেছে; ইহার প্রতিবিধান না হইলে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম আর রক্ষা পাইবে না। আচার্য্য বুঝিলেন তাঁহার কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। তিনি সশিষ্য রামেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সসৈন্য রাজা সুধন্বাও তাঁহার সহিত চলিলেন; তদ্ব্যতীত আরও বহু লোক আচার্য্যের সহিত চলিলেন। সে এক বিরাট বাহিনী! কাহারও হাতে ধ্বজাপতাকা, কাহারও হাতে শঙ্খ, কাহারও হাতে ঘণ্টা, কাহারও হাতে কাঁসর, কাহারও হাতে মৃদঙ্গ,—তাঁহারা আচার্য্যের রচিত

মধুর স্তোত্রাবলী সমস্বরে তানলয় সহযোগে গাহিতে গাহিতে চলিয়াছেন,—বাস্তবিকই এদৃশ্য অবর্ণনীয়, এ দিগ্বিজয়-দৃশ্য রাজন্যবর্গের দিগ্বিজয়দৃশ্য অপেক্ষা কত মহীয়ান্, কত হৃদয়স্পর্শী! তাঁহারা প্রথমে মধ্যার্জ্জুন নামক একটী শৈবতীর্থে উপস্থিত হইলেন; এখানে কালীতারা মহাবিদ্যা ও মধ্যার্জ্জুন নামক শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। মধ্যার্জ্জুন শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের আবাসস্থল। আচার্য্য এস্থানে আসিয়া মন্দির-প্রাঙ্গনে আসন স্থাপন করিলে, তাঁহার অদ্বৈতবাদ শুনিবার জন্য দলে দলে ব্রাহ্মণপণ্ডিত আসিতে লাগিলেন। আচার্য্য সুন্দর ও সুমধুর কণ্ঠে তাঁহার অদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। উপস্থিত জনমণ্ডলী নবীন সন্ন্যাসীর মুখে শাস্ত্রের এই নূতন ব্যাখ্যা শুনিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার দিকে দেখিতে লাগিলেন। স্মরণাতীত কাল হইতে মধ্যার্জ্জুনে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের স্রোত চলিয়াছে। পণ্ডিতগণ যাগযজ্ঞব্রতের অনুষ্ঠানেই মুক্তি বা অক্ষয় স্বর্গ মনে করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু আজ আচার্য্যের মুখে একি নূতন কথা! কর্ম্মে মুক্তি নহে—জ্ঞানেই মুক্তি!

আচার্য্যের অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা শেষ হইবার পর এক পণ্ডিত দাঁড়াইয়া জোড়হাতে কহিলেন, "মহাত্মন্! আপনার মুখে অদ্বৈতবাদ শুনিয়া আমরা খুবই মুগ্ধ হইয়াছি; কিন্তু আমাদের বহুদিনের সংস্কার ত্যাগ করিয়া আমরা ইহা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তর্ক দ্বারা

ইহার মীমাংসা হইবে না। অনেক সময় কেবল পাণ্ডিত্যের সাহায্যেই তর্কে জয়লাভ সম্ভব হয় না,—কাজেই তর্কই সত্য নির্দ্ধারণের এক মাত্র উপায় হইতে পারে না। আপনি যে অদ্বৈতবাদ প্রচার করিতেছেন, তাহা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমরা সকলেই এমন একটি প্রমাণ পাইতে চাই, যাহাতে আমাদের সকল সন্দেহই দূর হয়। এই জন্য আমি বলিতেছি, আপনি যদি এই মধ্যার্জ্জুন শিবের মুখ দিয়া 'অদ্বৈতবাদ সত্য' এই কথা বলাইতে পারেন, তবেই আমরা নিঃসন্দেহে আপনার মত গ্রহণ করিতে পারি। পণ্ডিতের কথা শুনিয়া চারিদিক হইতে সম্মতিসূচক কলরব উত্থিত হইল। আচার্য্যের মুখ গম্ভীর আকার ধারণ করিল,—তিনি চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার এই ভাব লক্ষ্য করিয়া সকলেই নীরব ও নিস্তব্ধ হইল। সকলেই ব্যাপার কি দাঁড়ায় দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উৎসুক নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। আচার্য্য নিজের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিয়া প্রার্থনা করিলেন, "প্রভু, তুমিই আমাকে এ কার্য্যে প্রেরণা দিয়াছ ; অতএব সর্ব্বসমক্ষে তোমাকেই মুখ ফুটিয়া 'অদ্বৈত-বাদ সত্য' এই কথা বলিতে হইবে।" ভগবান্ ভক্তের দাস ; কাজেই ভক্তের মান রাখিতে—সম্মান বাড়াইতে—তাঁহাকে ভক্তের অনুরোধ রক্ষা করিতে হইল। মন্দিরে সহস্র-সূর্য্যকিরণসদৃশ জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল এবং তাহার মধ্য হইতে বিশ্বপতি বিশ্বনাথমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া 'অদ্বৈতবাদ

সত্য’ এই কথা সর্ব্বজনসম্মুখে তিনবার উচ্চারণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। জনমণ্ডলী বিস্ময়স্তব্ধ! একি স্বপ্ন—না সত্য! অসম্ভব সম্ভব হইল, পাষাণমূর্ত্তির মুখে কথা ফুটিল। সন্দেহ করিবার আর উপায় রহিল না; সকলেই অদ্বৈতবাদ মানিয়া লইলেন এবং অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। আচার্য্যের জয়ধ্বনিতে তখন সেস্থানের গগন ও পবন মুখরিত হইয়া উঠিল।

মধ্যার্জ্জুন ত্যাগ করিয়া আচার্য্য বহু স্থানে এবং বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে আপন মত প্রচার করিতে করিতে রামেশ্বর-তীর্থে আসিলেন। রামেশ্বর তীর্থ হইয়া তিনি শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইলেন। এখানেও ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পাঞ্চরাত্র, প্রভৃতি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বাস। অদ্বৈতবাদ ইহাদের মধ্যে প্রচারিত হইলে অনেকেই তাহা গ্রহণ করিলেন। শ্রীরঙ্গম হইতে কর্ণাট-উজ্জয়িনীদেশে আসিলেন এবং আসিবার সময় পথিমধ্যে শত শত তীর্থস্থানের সংস্কার করিতে করিতে আসিলেন। কাপালিকরাজ ক্রকচ এখানে বাস করেন; তাঁহার শিষ্য উগ্রভৈরবের মস্তকচ্ছেদনের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ক্রকচও কি করিয়া আচার্য্যের প্রাণনাশ করা যায় সে উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সময় তাঁহার উপাস্য-দেবতা “সংহার ভৈরব” একদিন তাঁহাকে দর্শন দিয়া আচার্য্যের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে নিষেধ এবং তাঁহার মত গ্রহণ করিতে আদেশ করেন। কাজেই ক্রকচ আচার্য্যের

আশ্রয় লইলেন। তৎপরে অন্ধ্রদেশের বহু স্থান ভ্রমণ করিয়া আচার্য্য পুরীতে আসিলেন। পুরী হিন্দুদিগের আর একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ স্থান। এখানে শত শত মন্দির আছে, তন্মধ্যে জগন্নাথদেবের মন্দিরই শ্রেষ্ঠ। প্রতিবৎসর রথযাত্রার সময় এখানে সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। পুরী নীলাম্বু বঙ্গোপসাগরের তটে অবস্থিত। আচার্য্য এখানেও দেখিলেন মন্দিরে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি নাই। বিধর্ম্মীর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিগ্রহগুলিকে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর হইতে আর সেগুলিকে পাওয়া যাইতেছে না। পুরীর নিকটেই চিল্কাহ্রদ; আচার্য্য তথাকার অধিবাসিবৃন্দ ও মন্দিরের পূজারিগণকে চিল্কাহ্রদের তীরবর্ত্তী একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, সেই স্থানে জগন্নাথদেবের বিগ্রহ পাওয়া যাইবে। লোকজন সেই স্থান খনন করিয়া একটি স্বর্ণ পেটিকায় দারুময় জগন্নাথদেবের বিগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন। তখন খুব ধুমধামের সহিত মন্দিরে উক্ত বিগ্রহের পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা হইল। এইরূপে আচার্য্য যেখানেই উপস্থিত হইতে লাগিলেন, সেখানেই লুপ্তপ্রায় তীর্থগুলির সংস্কার হইতে লাগিল। পুরী ত্যাগ করিয়া আচার্য্য প্রয়াগে আসিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে কুমারিলভট্ট যখন তুষানলে প্রাণত্যাগ করেন, তখন একবার তিনি এখানে আসিয়াছিলেন। এখানেও বায়ু, বরুণ, ভূমি, তীর্থ, আকাশ, প্রভৃতি বহু সম্প্রদায় এবং বহু

মতাবলম্বী উপাসকগণের বাসস্থান। অনেকেই আচার্য্যের নিকট আসিয়া তাঁহার নূতন মতবাদ শুনিতে লাগিলেন, এবং কেহ কেহ তাঁহার অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিছু-কাল তথায় অবস্থান করিয়া যখন দেখিলেন তীর্থরাজ প্রয়াগে তাঁহার মত সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তখন তিনি প্রয়াগ ত্যাগ করিয়া কাশীধাম অভিমুখে চলিলেন।

এক যুগ—বার বৎসর—অতীত হইয়াছে তিনি এই কাশীধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বার বৎসর পরে পুনরায় তিনি সশিষ্য বাবাবিশ্বনাথের রাজ্যে—কাশীধামে—ফিরিয়া আসিলেন। এখানে পৌঁছিয়াই সর্ব্বপ্রথমে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন এবং তাহারপর কাশীর শ্রেষ্ঠঘাট মণিকর্ণিকার নিকটে আসন স্থাপন করিলেন। অতীতের কত স্মৃতিই আজ তাঁহার হৃদয়পটে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। এখানেই বাবা বিশ্বনাথের নিকট হইতে ভাষ্যরচনার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—এইখানেই মাতা অন্নপূর্ণা তাঁহাকে দর্শন দিয়া তাঁহার ভ্রম নিরসন করিয়াছিলেন। কাশীধামে আচার্য্যের আগমনের কথা শুনিয়া দলে দলে নানা সম্প্রদায়ের উপাসক-গণ আসিয়া তাঁহার সঙ্গে বিচার করিতে লাগিলেন এবং অনেকেই তাঁহার অদ্বৈতমত গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

কাশীধামে ভারতের সকল প্রদেশের লোকই বাস করে। সৌরাষ্ট্রবাসিগণ আচার্য্যকে তাঁহাদের দেশে লইয়া যাইবার জন্য বড়ই আগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন। আচার্য্যের ইচ্ছা,

অনিচ্ছা কিছুই নাই—পারিপার্শ্বিক অবস্থা যখন যেরূপ কর্ম্মে তাঁহাকে নিযুক্ত করে, তিনি নির্লিপ্তচিত্তে তাহাই করিয়া যান। তিনি সৌরাষ্ট অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে উজ্জয়িনীতে ভাস্কর পণ্ডিতকে পরাজিত করিয়া তিনি সৌরাষ্ট্রে উপনীত হইলেন। সৌরাষ্ট্রে গির্ণার, সোমনাথ, ও প্রভাসতীর্থ অবস্থিত। প্রসিদ্ধ গির্ণার পর্ব্বতোপরি অম্বিকাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত; প্রভাস, শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি; আর সোমনাথে সোমনাথ নামক প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। আচার্য্য এই সকল তীর্থ দর্শন করিলেন এবং এই সকল স্থানেও নিজের মত প্রচার করিলেন। তৎপরে দ্বারকা, গুর্জ্জর, পুষ্করতীর্থ, সিন্ধু, গান্ধারদেশ প্রভৃতি অনেক স্থান অতিক্রম করিয়া অবশেষে কাশ্মীরের শারদাপীঠে উপনীত হইলেন। কাশ্মীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আধারভূমি; কথায় বলে ভূস্বর্গ কাশ্মীর! এখানে বিদ্যাপীঠের সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজিত করিয়া সর্ব্বজ্ঞ উপাধি লাভ করিয়া তবে শারদাদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে ক্রমান্বয়ে চারিটি দ্বার অতিক্রম করিতে হয়; প্রতি দ্বারেই বড় বড় পণ্ডিতগণ বসিয়া আছেন। মন্দিরে যিনিই প্রবেশ করিতে চাহিবেন, তাঁহাকেই পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসিত সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া তবে মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইবে। আচার্য্য যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ,—সকল দ্বারে অবস্থিত পণ্ডিত-মণ্ডলীর প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

নিকটেই কুণ্ড রহিয়াছে,—তাহার জলস্পর্শ করিতে হয়। শারদাদেবী বড়ই জাগ্রত দেবতা। আচার্য্য কুণ্ডের জলস্পর্শ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় আকাশবাণী হইল, "বৎস শঙ্কর! তুমি পণ্ডিতদের সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছ, কিন্তু তুমি যে পবিত্রদেহ তাহার প্রমাণ কি? পবিত্রদেহ না হইলে কেহই আমার এ কুণ্ডের জলস্পর্শ করিতে পারে না।" আচার্য্য সে কথা শুনিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন, কিন্তু তাহারপর কহিলেন, "মাতঃ! আপনি ত সবই জানেন, আমি নিজ মুখে আপনার নিকট আর সে কথা কি বলিব?" তৎপর আচার্য্য নানারূপ স্তুতিদ্বারা শারদাদেবীর বন্দনা গাহিতে লাগিলেন। দেবী তখন সন্তুষ্ট হইয়া কুণ্ডের জলস্পর্শ করিতে আদেশ দিলেন। চতুর্দ্দিকে জয় জয়কার ধ্বনি উত্থিত হইল। আচার্য্য কুণ্ডের জল স্পর্শ করিলেন। শারদাপীঠে কিছুকাল অবস্থান করিয়া তথায় অদ্বৈতবাদ প্রচার এবং একটি মঠ স্থাপন করিলেন। কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া আচার্য্য তক্ষশিলা, জ্বালামুখী, নৈমিষ্যারণ্য, অযোধ্যা, মিথিলা, মগধরাজ্যে বৌদ্ধবিহার, নালন্দা, রাজগৃহ, গয়াধাম, প্রভৃতি বহু স্থান ও বহু তীর্থ দর্শন এবং ঐ সকল স্থানে নিজ মত প্রচার করিতে করিতে অবশেষে 'সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতল' বঙ্গদেশে উপস্থিত হইলেন।

বঙ্গদেশ হইতে আচার্য্য আসামের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে

উপস্থিত হইলেন। এখানে কামাখ্যাদেবীর মন্দির প্রসিদ্ধ। ইহা একটি পীঠস্থান। দক্ষযজ্ঞে শিবসীমন্তিনী সতী পতিনিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করেন; বিষ্ণুচক্রে সেই দেহ কর্ত্তিত হইয়া ভারতের নানাস্থানে পতিত হয়। প্রায় বাহান্নটি স্থানে সতীর দেহাংশ পতিত হয়। যেখানে যেখানে সতীর দেহাংশ পতিত হয়, সেস্থানগুলিকে পীঠস্থান কহে। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর তান্ত্রিক-প্রধান স্থান। এখানে বহু সিদ্ধপুরুষ বাস করেন, তন্মধ্যে অভিনয়গুপ্ত প্রধান। আচার্য্য পর্ব্বতোপরি অবস্থিত কামাখ্যা-দেবী দর্শন করিলেন; তাহারপর এক নির্জ্জন স্থানে আসন স্থাপন করিয়া আপন মত প্রচার করিতে লাগিলেন। অভিনয়-গুপ্ত আচার্য্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু জয়লাভ করিতে পারিলেন না। নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়া তিনি আচার্য্যের প্রাণনাশ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি তান্ত্রিক-মন্ত্রসিদ্ধ; মন্ত্রদ্বারা আচার্য্যের শরীরে রোগ উৎপাদন করিবেন ঠিক করিলেন। বাহিরে একথা কিছুই প্রকাশ হইতে না দিয়া তিনি আচার্য্যের চরণে আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। আচার্য্যের নিকট শত্রুমিত্র ভেদ নাই, সকলেই সমান। তিনি অভিনয়গুপ্তকে আশ্রয় দিলেন। অভিনয়গুপ্ত খুব যত্নের সহিত আচার্য্যের সেবা করেন। এইরূপে কিছু কাল গত হইলে, আচার্য্যের গুহ্যদ্বারে একটি ফোড়া উঠিল—ইহাকে ভগন্দর কহে। মন্ত্রশক্তির সাহায্যে এইরূপে রোগ উৎপাদন করিয়া প্রাণনাশ করিবার

চেষ্টাকে অভিচারিক ক্রিয়া কহে। ফোড়াটী পাকিয়া পুঁজরক্ত বাহির হইতে লাগিল; শিষ্যগণ মহাভাবনায় পড়িলেন। তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষার অন্ত নাই, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কত কবিরাজ আসিল, কত রকমের চিকিৎসা হইল; অবশেষে রাজবৈদ্য আসিলেন,—তিনিও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। আচার্য্যের মনে কিন্তু এতটুকুও চঞ্চলতা নাই,—তাঁহার মুখ দেখিয়া তিনি যে এত বড় রোগ যন্ত্রনায় ভুগিতেছেন, তাহার বুঝিবারও উপায় নাই। মানুষ যখন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তখন বাহিরের রোগশোক, দুঃখকষ্ট কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। পদ্মপত্র জলে থাকিয়াও যেমন নির্লিপ্ত থাকে, আত্মজ্ঞানীর পক্ষে সাংসারিক সকল সুখদুঃখের কারণও ঠিক সেইরূপ।

গুরুগতপ্রাণ পদ্মপাদ উপায়ান্তর না দেখিয়া আবার তাঁহার ইষ্টদেবতা নৃসিংহদেবকে স্মরণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে দর্শন দিয়া স্বর্গের রাজবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করিতে বলিলেন; পদ্মপাদ তাহাই করিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় আসিয়া কহিলেন, "বৎস পদ্মপাদ, তোমার গুরুদেবের এই রোগ অভিচারিক ক্রিয়ার ফল, কোনরূপ ঔষধপত্রদ্বারা ইহার উপশম হইবে না। অভিচারিক ক্রিয়ার দ্বারা যে রোগ উৎপাদন করা হয়, তাহা একমাত্র অভিচারিক ক্রিয়ার সাহায্যেই দূরীভূত হইতে পারে, অতএব তুমি তাহাই কর।"

এই বলিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় অদৃশ্য হইলেন। পদ্মপাদ অভিচার ক্রিয়া করিতে মনস্থ করিয়া আচার্য্যকে সকল কথা কহিলেন। আচার্য্য আপত্তি করিলেন, কিন্তু শিষ্যগণ সে আপত্তি মানিয়া লইতে রাজি হইলেন না। আচার্য্য বুঝিলেন ইহাও দৈব ইচ্ছা—কাজেই নীরব রহিলেন। পদ্মপাদ অভিচার ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। ফলে, অভিনয়গুপ্তের ভগন্দর রোগ দেখা দিল; তিনি এ কথা গোপন রাখিয়া আচার্য্যের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অভিনয়গুপ্ত মন্ত্রশক্তি দ্বারা নিজেকে রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু বৃথাই তাঁহার চেষ্টা। পদ্মপাদের মত সিদ্ধপুরুষ যখন যে কাজে হাত দেন, তাহা ব্যর্থ করা ত আর সহজ কথা নয়। ক্রমেই অভিনয়গুপ্তের রোগ বাড়িয়া চলিল, সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্যও নিরাময় হইতে লাগিলেন। অবশেষে অভিনয়গুপ্তের মৃত্যু হইল এবং আচার্য্যও সম্পূর্ণরূপে সারিয়া উঠিলেন। সাধারণের মধ্যে যখন একথা ছড়াইয়া পড়িল, তখন আর কেহই আচার্য্যের প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে সাহস করিল না। এখানেও অনেকে তাঁহার মত গ্রহণ করিল।

আট

আচার্য্য সুস্থ হইয়া পুনরায় দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন; কারণ, যতদিন দেহ, ততদিন কাজ। আসাম হইতে আচার্য্য গৌড়দেশে আসিলেন; এখানে মুরারি মিশ্র নামক মীমাংসাদর্শনের একজন খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। আচার্য্যের অদ্বৈতবাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা তাঁহার এত ভাল লাগিল যে, তিনি তাহা অচিরে গ্রহণ করিলেন।

এই সময় আচার্য্য একদিন গঙ্গাতীরে আসন স্থাপন করিয়াছেন। বেলাবসানে সূর্য্যদেব অস্তগমনোন্মুখ; সন্ধ্যার অন্ধকার চতুর্দ্দিক ছাইয়া ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছে; এমন সময় অদূরে এক তেজপুঞ্জকলেবর, মুণ্ডিতমস্তক, দণ্ডকমণ্ডলুধারী, গলে রুদ্রাক্ষমালাপরিশোভিত এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীমূর্ত্তি দেখিয়া তিনি বিস্ময়ান্বিত হইলেন। আচার্য্য ধ্যানমগ্ন হইয়া সন্ন্যাসীর পরিচয় পাইলেন—ইনিই তাঁহার গুরুদেবের গুরুদেব, গৌড়পাদাচার্য্য। আচার্য্য সসম্ভ্রমে আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। উভয়ের সম্পর্ক বড় মধুর—বড় আনন্দের। উভয়ের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা হইল,—তাহারপর গৌড়পাদ আচার্য্যকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় লইলেন।

নেপালে পশুপতিনাথ হিন্দুদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ; কিন্তু বিধর্ম্মীদের অত্যাচারে পশুপতিনাথের যথাবিধি পূজা ও অর্চ্চনা হয় না। বৌদ্ধগণ এ সময় এখানে প্রবল, কাজেই এখানে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবহারও লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। শিষ্যগণ একথা শুনিয়া নেপালে যাইবার জন্য আচার্য্যের নিকট প্রার্থনা করিলেন এবং তিনিও সম্মত হইলেন। পশুপতিনাথ যাইবার পথ বড়ই দুর্গম: হিমালয়ের দুরারোহ পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া সেখানে যাইতে হয়। পথ যতই দুর্গম হউক না কেন আচার্য্য সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া সশিষ্য পশুপতিনাথ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সে সময় শিবদেব নেপালের রাজা। সশিষ্য আচার্য্য সেখানে উপস্থিত হইলে রাজা শিবদেব তাঁহাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন, এবং আচার্য্যের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন। আচার্য্য সেখানে পৌঁছিয়া মন্দিরের বড় দুরবস্থা দেখিলেন। মন্দির আবর্জ্জনাপূর্ণ, পশুপতিনাথের নিয়মিত পূজা বা আরতি, কিছুই হয় না। শিষ্যগণ তাড়াতাড়ি মন্দির পরিষ্কার করিলেন এবং তখন যথানিয়মে পূজা ও আরতি আরম্ভ হইল। রাজা নিজেও অদ্বৈতবাদ যাহাতে রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন।

কিছুকাল নেপালে বাস করিয়া সকলের ইচ্ছায় আচার্য্য পুনরায় বদরিকাশ্রমের দিকে যাত্রা করিলেন। আচার্য্যের দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ হইয়াছে; কাজেই তিনি হিমালয়ের নীরব

নির্জ্জন প্রদেশের শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লইবার জন্য চলিয়াছেন। আচার্য্য জ্যোতির্ধামে আসিলেন ; এখানকার রাজা পূর্ব্বেই তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন এবং তাঁহার চেষ্টায় ইতোমধ্যে উত্তরাখণ্ডের সমস্ত তীর্থগুলির উদ্ধার এবং সংস্কার হইয়াছিল। এখানে কিছু কাল বাস করিয়া আচার্য্য যথাসময়ে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তাঁহার স্বহস্তপ্রতিষ্ঠিত নারায়ণমূর্ত্তি মন্দিরে বিরাজিত হইয়া ভক্তের অর্ঘ্য ও পূজা গ্রহণ করিতেছে। আচার্য্যের জ্ঞানসমুদ্র উথলিয়া উঠিল—আনন্দ-উদ্বেলিত কণ্ঠে তিনি একটি সদ্যরচিত স্তোত্রদ্বারা নারায়ণের স্তুতি করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাস-গুহায় আশ্রয় না লইয়া তিনি মন্দিরপ্রাঙ্গনেই আসন স্থাপন করিলেন। সেখানে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে, শিষ্যদের একান্ত ইচ্ছায় পুনরায় কেদারনাথের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে সর্ব্বত্রই তীর্থগুলির সুশৃঙ্খলা এবং প্রতি মন্দিরে নিয়মিত পূজা অর্চ্চনাদি হইতেছে দেখিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইলেন। যথাসময়ে সকলে কেদারনাথে পৌঁছিলেন। চতুর্দ্দিকের সেই শান্তগম্ভীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে কেদারেশ্বরের মন্দির অবস্থিত ; যাত্রী-মাত্রেরই নয়ন ও মন সেই অনুপম সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া থাকে। এইখানে সশিষ্য আচার্য্য বাস করিতে লাগিলেন।

কেদারনাথে অবস্থানকালে একদিন শিষ্যদের মধ্যে কথা উঠিল যে, আচার্য্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ভারতের উত্তর-

প্রান্ত হইতে দক্ষিণপ্রান্ত এবং পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত, সর্ব্বত্র বৈদিকধর্ম্মের প্রচার করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিলেন, আচার্য্যের দেহত্যাগের পর যাহাতে উহা নষ্ট না হয়, তাহার কি ব্যবস্থা হইতে পারে। রাজা সুধন্বা কহিলেন, "ইহার একমাত্র উপায় হইতেছে ভারতের চারিদিকে চারিটি মঠ স্থাপন করা। তথায় এক একজন মঠাধীশ থাকিয়া সন্ন্যাসীর আদর্শে নিজ জীবন তো পালন করিবেনই, অধিকন্তু সর্ব্বসাধারণের মধ্যেও যাহাতে ধর্ম্মের স্রোত অব্যাহত থাকে,সেজন্য প্রচারের ব্যবস্থা তাঁহাকেই করিতে হইবে। ত্যাগী ও আদর্শ সন্ন্যাসীর মঠগুলি তীর্থ-স্থানরূপে পরিণত হইয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে এবং সেইগুলিই সকলকে উদ্বুদ্ধ রাখিবে।" সকলেরই এ কথা পছন্দ হইল ; সে কথা পরে আচার্য্যের কাণেও উঠিল এবং তিনিও ইহাতে সম্মত হইলেন। তখন ঠিক হইল, ভারতের চারিদিকে চারিধামে চারিটি মঠ স্থাপিত হইবে— দ্বারকায় শারদা মঠ, পুরীধামে গোবর্দ্ধন মঠ, জ্যোতির্ধামে জ্যোতিঃ মঠ, এবং রামেশ্বরে শৃঙ্গেরী মঠ। আচার্য্যের চারিজন শ্রেষ্ঠ শিষ্যের উক্ত চারি মঠে মঠাধীশ হইবার ঠিক হইল। শারদামঠে সুরেশ্বরাচার্য্য, গোবর্দ্ধনমঠে পদ্মপাদ, জ্যোতির্মঠে তোটকাচার্য্য এবং শৃঙ্গেরীমঠে হস্তামলক মঠাধ্যক্ষ হইবেন। আচার্য্য তাঁহার সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়কে আবার দশভাগে বিভক্ত করিলেন, তাঁহাদের নাম হইল

গিরি, পুরী, ভারতী, সরস্বতী, বন, অরণ্য, সাগর, পর্ব্বত, তীর্থ ও আশ্রম; আজকাল এক কথায় ইহাদিগকে "দশনামা" সন্ন্যাসী সম্প্রদায় কহে। এই দশনাম্নাদের মধ্যে তীর্থ ও আশ্রম শারদামঠে, বন ও অরণ্য গোবর্দ্ধনমঠে, গিরি, পর্ব্বত ও সাগর জ্যোর্তিমঠে এবং সরস্বতী, ভারতী ও পুরী শৃঙ্গেরীমঠে বাস করিবেন। ভবিষ্যতে যিনি যে মঠের অধীনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, তাঁহার নাম সেই সেই মঠবাসী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের নামানুসারে হইবে। কোন্ মঠে কোন্ বেদের আলোচনা হইবে তাহাও ঠিক হইল। শারদামঠে সামবেদ, গোবর্দ্ধনমঠে ঋক্‌বেদ, জ্যোতির্মঠে অথর্ব্ববেদ এবং শৃঙ্গেরীমঠে যজুর্ব্বেদ পঠন পাঠন হইবে। তাহারপর প্রত্যেক মঠবাসী ব্রহ্মচারীদের কি কি উপাধি হইবে তাহাও ঠিক হইল—শরদামঠে 'স্বরূপ', গোবর্দ্ধনমঠে 'প্রকাশ', জ্যোর্তিমঠে 'আনন্দ' এবং শৃঙ্গেরীমঠে 'চৈতন্য' হইবে। প্রত্যেক মঠ-বাসীদেরই শ্রুতির এক একটি মহাবাক্য আদর্শস্থানীয় হইবে ঠিক হইল; যথা "তত্ত্বমসি" শারদা মঠবাসীদের, "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" গোবর্দ্ধন মঠবাসীদের, "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" জ্যোর্তিমঠ-বাসীদের এবং "অহং ব্রহ্মাঽস্মি" শৃঙ্গেরী মঠবাসীদের। তাহারপর মঠ-পরিচালনা সম্বন্ধে সকল রকম ব্যবস্থা সম্বলিত এক পুস্তক রচিত হইল। এইরূপে ভারতে বৈদিকধর্ম্মের প্রচার যাহাতে বন্ধ না হয়, সেজন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইল।

আচার্য্যের বয়স বত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইল। তাঁহার আয়ুঃ-কাল শেষ হইয়াছে। এই পাঞ্চভৌতিক দেহদ্বারা যাহা করিবার ছিল, তাহাও সম্পন্ন হইয়াছে; এইবার তাঁহার দেহ সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া অদ্বৈত ব্রহ্মানন্দে বিলীন হইবার সময় উপস্থিত হইল। একদিন তিনি সমস্ত শিষ্যমণ্ডলীকে ডাকিয়া কহিলেন, "বৎসগণ! আমার আয়ুঃকাল শেষ হইয়াছে; এই দেহদ্বারা শ্রীভগবানের যাহা করাইবার ছিল তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে; অতএব আমি এখন এই দেহ সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া যাইব। তোমরা এজন্য দুঃখিত হইও না। দেহ বিনশ্বর, কিন্তু আত্মার জন্ম, মৃত্যু, ক্ষয় বা বৃদ্ধি, কিছুই নাই।" এইরূপে শিষ্যগণকে নানারূপ উপদেশ দিয়া তিনি সমাধিস্থ হইলেন; তাঁহার সে সমাধি আর ভঙ্গ হইল না।

ওঁ তৎ সৎ